সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

এপ্রিল ২০২৩

ঐতিহ্যের মেলবন্ধন বাংলা নববর্ষ

৩০ এপ্রিল ২০২৩ ভারতীয় হাই কমিশন ঢাকা মান কী বাত-এর ১০০তম পর্বের একটি বিশেষ স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করে। বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় শিক্ষার্থী ও নাগরিকগণ হাই কমিশন প্রাঙ্গনে এই বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে যোগ

২২ এপ্রিল ২০২৩-এ হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বঙ্গভবনে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের সঙ্গে ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন

২২ এপ্রিল ২০২৩-এ হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা গণভবনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন

হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ১৬-১৮ এপ্রিল ২০২৩ কুষ্টিয়া ও রাজশাহীতে ৩ দিনের একটি সফরে যান। সফর চলাকালে তিনি সোনামসজিদ-মেহেদিপুর স্থলবন্দর, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, বরেন্দ্র জাদুঘর, লালন শাহ মাজার, শহীদ এএইচএম কামারুজ্জামানের সমাধি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ উক্ত অঞ্চলের কিছু উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক স্থান পরিদর্শন করেন। সোনামসজিদ স্থলবন্দরে মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বিজনেস চেম্বারসমূহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫১ | সংখ্যা ০৪ | চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৯-৩০ | এপ্রিল ২০২৩

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
e-mail : inf2.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিকস শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রবিন্দু
ওড়িশা

বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম, ভূপ্রকৃতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ ভারত। ভারতকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করেনি প্রকৃতি। দেশটি যেন একটা ছোট পৃথিবী। ভারতের মধ্যে ওড়িশা এমনই একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন জনপদ।

সূচি

প্রচ্ছদপ্রবন্ধ — বাংলা নববর্ষ
সম্প্রীতির মেলবন্ধন ও সাম্প্রতিক ভাবনা ॥ বিশ্বজিৎ ঘোষ ০৩
রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন ও বর্ষবরণ ॥ দীপংকর গৌতম ০৬

প্রবন্ধ — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কাজী আবদুল ওদুদের বিবেচনায় ॥ মিজান টিটু ০৯

নিবন্ধ — ধামাইল সংস্কৃতিতে নারী ॥ জয়শ্রী সরকার ১২

ভ্রমণ — বশিষ্ঠ মুনি আশ্রমে একদিন ॥ সুমন্ত গুপ্ত ১৫

স্মরণ — শঙ্খ ঘোষের নাট্যচেতনা ॥ অবন্তিকা পাল ১৭
পিতা বেলাল চৌধুরীর রৌদ্রছায়ায় ॥ প্রতীক চৌধুরী ২২

হেঁসেলঘর — রসনায় বৈশাখ ২০

কবিতা — সুধীর দত্ত ॥ সৌমনা দাশগুপ্ত ॥ খালেদ হোসাইন ॥ নীলাব্জ চক্রবর্তী
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ॥ হোসেন দেলওয়ার ॥ সঞ্জয় ঘোষ
ফেরদৌস নাহার ॥ শিমুল সালাহ্উদ্দিন ॥ অরূপ কিষান
শিশির আজম ২৪-২৫

অনূদিত ছোটগল্প — অঙ্কন-শিক্ষা ॥ আনুশকা যশরাজ ॥ ভাষান্তর : মুহসীন মোসাদ্দেক ২৬

জন্মদিন — সন্‌জীদা খাতুন নবতিবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় ৩০

ছোটগল্প — পল অনুপল ॥ হামীম কামরুল হক ৩৪

ধারাবাহিক উপন্যাস — বকেয়া হিসেব ॥ শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭

কেন্দ্রবিন্দু — ওড়িশা ॥ মো. মোস্তাক খান ৪০

ফিচার — হাসির অবতার শ্রী শরৎচন্দ্র দাদাঠাকুরের রসিকতা ॥ আহমেদ রিয়াজ ৪৪

শেষ পাতা — ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী পুরুষ
উল্লাসকর দত্ত ॥ হিমাদ্রিশেখর সরকার ৪৮

সম্পাদকীয়

ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল বিভক্তির ঊর্ধ্বে বাঙালির উৎসবের সংখ্যা হাতেগোনা। বাঙালি যে কয়টা অনুষ্ঠানে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে, নববর্ষ-উৎসব তার অন্যতম। এই জনগোষ্ঠী ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ঐতিহাসিকভাবে পালন করে আসছে বাংলা নববর্ষ উৎসব। নতুন বছরকে আহ্বান করা শতাব্দী পরম্পরায় চলে আসা বাঙালির কাছে এ কেবল উৎসব নয়, যেন শেকড়ের কাছে ফিরে যাওয়ার দিন। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরাসহ দেশ-বিদেশে বসবাসরত প্রতিটি বাঙালি এই দিন নিজ সংস্কৃতির মাঝে নিজেকে খুঁজে পায়। বৈশাখের উদযাপন অনুষ্ঠান পরিণত হয় বাঙালি জনগোষ্ঠীর মিলন মেলায়। বাঙালি জাতি এই নববর্ষকে সাদরে আবাহন করে।

বঙ্গাব্দ, বাংলা সন বা বাংলা বর্ষপঞ্জি হলো বঙ্গদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী সৌরপঞ্জিকাভিত্তিক বর্ষপঞ্জি। মূলত সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৌরদিন গণনা শুরুর রীতি রয়েছে। আমরা জানি, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে মোট ৩৬৫ দিন কয়েক ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়। এই সময়টাই এক সৌর বছর। গ্রেগরীয় সনের মতন বঙ্গাব্দেও মোট ১২ মাস।

বঙ্গাব্দের সূচনা সম্পর্কে ২টি মত প্রচারিত। প্রথম মত অনুযায়ী, গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক (রাজত্বকাল আনুমানিক ৫৯০-৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ) বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে শশাঙ্ক বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। আনুমানিক জুলীয় বর্ষপঞ্জির বৃহস্পতিবার ১৮ মার্চ ৫৯৪ এবং গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির শনিবার ২০ মার্চ ৫৯৪ বঙ্গাব্দের শুরু হয়েছিল।

দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, ইসলামি শাসনামলে হিজরি পঞ্জিকা অনুসারেই সকল কাজকর্ম পরিচালিত হতো। মূল হিজরি পঞ্জিকা চান্দ্রমাসের ওপর নির্ভরশীল। আকবর চেয়েছিলেন, মাসগুলোকে সৌর পদ্ধতিতে সাজুয্য করতে। কিন্তু চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের চেয়ে ১১-১২ দিন কম হয়। কেননা সৌর বছর ৩৬৫ দিন, আর চান্দ্র বছর ৩৫৪ দিন। একারণে চান্দ্র বছরে ঋতুগুলো ঠিক থাকে না। আর বঙ্গদেশে কৃষিসংশ্লিষ্ট কাজ ঋতুভিত্তিক। এজন্য মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে প্রচলিত হিজরি চান্দ্র পঞ্জিকাকে সৌর পঞ্জিকায় পরিবর্তন করা হয়। সম্রাট আকবর ইরান থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরি চান্দ্র বর্ষপঞ্জিকে পরিবর্তন করে সৌর বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব দেন। ফতুল্লাহ শিরাজীর সুপারিশে ফার্সি বর্ষপঞ্জির অনুকরণে ৯৯২ হিজরি মোতাবেক ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর হিজরি সৌর বর্ষপঞ্জির প্রচলন করেন। তবে তিনি ঊনত্রিশ বছর পূর্বে তার সিংহাসন আরোহনের বছর থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরি সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। ৯৬৩ হিজরি সালের মুহররম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ মাস, এজন্য বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস এবং ১লা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়। সেই বাংলা নববর্ষ উদযাপনের সূচনা, এখন এটি বিশ্বের প্রায় তিরিশ কোটি বাঙালির প্রধানতম ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব। এছাড়া প্রকৃতিগতভাবেও বৈশাখ গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে ফসলি মাস, অন্যদিকে কালবৈশাখী। সব মিলিয়ে বৈশাখ উদ্দীপনামূলক মাস, যা আমাদের জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে।

আশা করি, ঐতিহ্যবাহী এই বর্ষবরণের বিপুল প্রাণশক্তি আমাদের সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি চেতনাকে এগিয়ে নেবে। আমরা প্রাণে প্রাণ বেঁধে আজীবন অটুট থাকব।

বর্তমান সংখ্যায়ও নিয়মিত বিভাগ থাকছে।

সকলের কল্যাণ হোক। শুভ নববর্ষ।

প্রচ্ছদপ্রবন্ধ

বাংলা নববর্ষ

সম্প্রীতির মেলবন্ধন ও সাম্প্রতিক ভাবনা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

বারো মাসে তেরো পার্বনের দেশ আমাদের এই জন্মভূমি। কথায় বলে বাঙালি আমুদে জাতি, উৎসবপ্রিয় জাতি। উৎসব পেলে অন্য সবকিছু ভুলে থাকতে পারে তারা। তবে লক্ষ করলেই দেখা যাবে–এত উৎসবের ভিড়েও ধর্মনিরপেক্ষ মিলিত বাঙালির উৎসবের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কয়টা উৎসব আছে আমাদের, যেখানে সবাই একনিষ্ঠভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, ধর্মীয় ও সামাজিক দেয়ালের ঊর্ধ্বে উঠে নিষ্ঠভাবে পালন করতে পারে প্রকৃত অংশগ্রহণকারীর ভূমিকা? সবার অংশগ্রহণে মিলিত বাঙালি যে কয়টা অনুষ্ঠানে মুখর হয়ে ওঠে, নববর্ষ-উৎসব তার অন্যতম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালি জনগোষ্ঠী ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে মিলিতভাবে পালন করে আসছে বাংলা নববর্ষ উৎসব।

উত্তরকালে একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস বা বিজয় দিবসের মতো সর্বজনীন উৎসব পালনের দিন আমরা পেয়েছি বটে, তবে এক্ষেত্রে নববর্ষ-উৎসব যে ভিন্ন মাত্রাসঞ্চারী, সেকথা বলাইবাহুল্য।

নববর্ষ বাঙালির দ্রোহচেতনা ও সঙ্ঘশক্তির অবারিত উৎস–তার অন্তরে আছে সম্প্রীতির মেলবন্ধনের অনেকান্ত আহ্বান। শতাব্দী পরম্পরায় চলে আসা নববর্ষই উৎসব বাঙালির কাছে কেবল উৎসব নয়, এ তার আপন উৎসে সংলগ্ন হবার দিন, নিজের ঠিকানায় আশ্রয় নেওয়ার দিন। মিলিত বাঙালিকে তার চেতনায় মূল স্রোতে সংহতি দিতে নববর্ষের দিনটি পালন করে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। বছরের এই একটি দিনে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব বাঙালি নিজ সংস্কৃতির ধারায় স্নাত হয়ে শুদ্ধ হওয়ার সাধনা করে।

ব্যক্ত হয়েছে যে, নববর্ষ আমাদের কাছে এখন সঙ্গচেতনার উজ্জ্বল স্মারক। নববর্ষের প্রভাতে মঙ্গল শোভাযাত্রা এখন চারুকলার সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বাংলাদেশে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মাত্রাকে ছাপিয়ে নববর্ষের শরীরে ও সত্তায় এখন প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক চারিত্র্য। সম্রাট আকবর-প্রবর্তিত নববর্ষ উৎসব ছিল প্রধানত অর্থনৈতিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। উনিশ শতকের শেষ দশকে রাজনারায়ণ বসু ইংরেজদের অনুসরণে নববর্ষ পালনের যে আয়োজন শুরু করেন, তাতে ক্রমে উৎসবটি অর্জন করে সামাজিক মাত্রা। এখন আমাদের নববর্ষ উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রেরণা, সকল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মাদনা, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী প্রেরণা। এভাবে নববর্ষ উৎসব অর্জন করে প্রতিবাদী রাজনৈতিক চারিত্র্য। তাই, এখন সমবেত বাঙালি যখন পয়লা বৈশাখকে বরণ করে, তখন কেবল একটি দিন বা একটি বছরকেই আবাহন করে না; বরং আবাহন করে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ চেতনাকে, আবাহন করে বাঙালির সংগ্রামী চেতনাকে, স্মরণ করে তার উজ্জ্বল ঐতিহ্যকে।

বিভাগোত্তর কালে, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে–বিশেষ করে বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে এসে নববর্ষ উৎসবের আর্থিক-সামাজিক চারিত্র্যের পরিবর্তন ঘটে–নববর্ষ উৎসব হয়ে ওঠে উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের রাজনৈতিক এক হাতিয়ার। এক্ষেত্রে 'ছায়ানট' পালন করে ঐতিহাসিক এক ভূমিকা। নববর্ষ উপলক্ষে রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আমাদের নববর্ষ উৎসবকে নতুন মাত্রায় অভিষিক্ত করে। ক্রমে ওই আয়োজনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলাদেশে গ্রামে-গঞ্জে। চারুকলার মঙ্গল-শোভাযাত্রা নববর্ষ উৎসবে আনে সমষ্টিচেতনার মাত্রা। পহেলা বৈশাখে এখন দেখা দেয় মিলিত বাঙালির সঙ্ঘচেতনার শক্তি। ঔপনিবেশিক আমলে যেমন, তেমনি স্বাধীনতা-পরবর্তী কালেও নববর্ষে আয়োজনসমূহ আমাদের জাতিগত ঐক্যের প্রতীকে পরিণত হয়। ঔপনিবেশিক শক্তি ভয় পেয়েছে নববর্ষের এই চারিত্র্য বদলে–স্বাধীন বাংলাদেশেও তাদের প্রেতাত্মারা, পরাজিত দানবেরা ভয় পায় নববর্ষের এই নতুন শক্তিকে। তাই রমনার বটমূলে তাদের বোমা ফাটাতে হয়, মারতে হয় নিরীহ মানুষকে। নববর্ষ উৎসব এখন বাঙালির কাছে সঙ্গচেতনায় উদীপ্ত হওয়ার উৎসব, আপন সত্তানুসন্ধানের উৎসব, জাতির ঠিকানা খোঁজার উৎসব। বৈশাখে এসে আমরা পুরোনোকে সরিয়ে নতুনকে আবাহন করি, এই ভাবনার চেয়ে উৎসবের রাজনৈতিক চারিত্র্যই এখন মনে হয়।

ধর্মনিরপেক্ষ চারিত্র্যই নববর্ষচেতনার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। এ কারণেই নববর্ষ হয়ে ওঠে সম্প্রীতির মেলবন্ধনের অবিনাশী উৎস। ধর্মের ভেদ, সামাজিক স্তরবিন্যাসগত পার্থক্য, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কিংবা ধনী-দরিদ্র নারী-পুরুষের বিষমতা এদিনে অনেকটাই দূর হয়ে যায়। নববর্ষ কেবল মধ্যস্তরের মানুষের নয় বরং তা কৃষক-শ্রমিক-দিনমজুর-সাধারণ মানুষ সকলের। একদিনের জন্যও হলেও বাঙালি এই দিনে ধর্মবিভেদকে দূর করে একাত্ম হয়ে যায়। নববর্ষের ভোরে খোলা আকাশের নিচে সমবেত হয়ে বাঙালি বুক ভরে বাতাস নিয়ে মনে করে আমি বাঙালি, বাংলা আমার মাতৃভাষা, বাংলাদেশ আমার দেশ। এই চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী–তারাও নিজ নিজ ঐতিহ্য অনুসারে নববর্ষকে আবাহন করে। সে-আবাহনে গোষ্ঠীচেতনার পাশাপাশি জাতীয় চেতনার উত্তাপও অনুভূতি হয়। সন্দেহ নেই, বাঙালি হয়ে ওঠার এই আয়োজনে কখনো কখনো দেখা দেয় অসঙ্গতি কিংবা হাস্যকর কোনো অনুষঙ্গ–কিন্তু তা কোনোভাবেই মূলচেতনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।

বাঙালির আছে দুটো প্রত্ন বিভাজন রেখা–একটি সাম্প্রদায়িক, অপরটি অর্থনীতিক। প্রথমটি আলম্ব, সে–বিভাজনে বাঙালি বিভক্ত হয়ে পড়ে হিন্দু কিংবা মুসলমান; দ্বিতীয় বিভাজনটি আনুভূমিক–সেক্ষেত্রে বাঙালি হয়ে পড়ে ধনী কিংবা গরিব। পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ বাঙালির এই দুই প্রাচীন বিভাজন রীতির বিপ্রতীপ চেতনা। কেবল বিপ্রতীপ নয়, বিপাক্ষিকও বটে। পহেলা বৈশাখ অসম্প্রদায়িক–তার মেলা হিন্দুমেলা নয়, তার মেলা মহররমের মেলাও নয়–তার মেলা বাঙালির মেলা, তার মেলা সম্প্রীতির মেলা।

বৈশাখী মেলায় হিন্দু কিংবা মুসলমান আসে না, আসে বাঙ্গালি নর-নারী আর সে মেলায় যে পণ্য ওঠে তাও বিশ্বায়নের পণ্য নয়, পুঁজিবাদের পণ্য নয়–সে পণ্য একান্তই বাঙালির ঘরের পণ্য, আমাদের জাতীয় চেতনার পণ্য। এভাবে বিশ্ব-পণ্যায়নের বিপক্ষে অলক্ষে দাঁড়িয়ে যায় পহেলা বৈশাখ। নববর্ষ ধনি ও গরিবকে এক কাতারে নিয়ে আসে–সবাইকে সে এক করতে চায়। পারে কিনা সে-প্রশ্ন বড় নয়, চাওয়াটাই বড়। এই চাওয়াটা আছে বলেই পহেলা বৈশাখ পুঁজিবাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়; তার বুকের মধ্যে আছে সাম্যের চেতনা, আছে ভেদ-বিলোপের বাসনা।

পুঁজিবাদ মানুষকে ইতিবাচক অনেক কিছু দিয়েছে, কিন্তু তার নেতিবাদী চেতনার সবচেয়ে বড় 'দান' বিচ্ছিন্নতা। পুঁজিবাদ কিংবা একালের বিশ্বায়ন মানুষকে কেবল বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করে মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তঃসম্পর্কের মৌলবন্ধন। আত্মরতির পঙ্কে মানুষের সামূহিক বিপন্নতাই যেন পুঁজিবাদের অন্তিম গন্তব্য। এ প্রেক্ষাপটেই জরুরি হয়ে ওঠে পহেলা বৈশাখ। শিক্ষিত শাহরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে পহেলা বৈশাখ মিলনের আহ্বান নিয়ে আসে, ডাক দেয় তাকে বৃহত্তর

লোকসমাজের সঙ্গে মিলনের। মাটি ও মানুষের সঙ্গে, দেশ ও ভাষার সঙ্গে, স্বপ্ন ও সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হতে আহ্বান জানায় নববর্ষের প্রথম ভোর–বিচ্ছিন্নতাপীড়িত মধ্যবিত্ত মানুষকে লোকপুরাণের ফিনিক্স পাখির মতো পুনর্গঠিত হবার আহ্বান জানায় বৈশাখের প্রথম সকাল। পুঁজিবাদ-সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা কাটাতে চায় নববর্ষ– তার আহ্বানটা মিলনের একাত্মতার, সহযোগের, সংহতির এবং সম্প্রীতির।

আমাদের জীবনে নির্দিষ্ট সময়ে নববর্ষ আসে, কিন্তু এসেও আসে না, এসেই চলে যায়; আর এ কারণেই মনে আসে নানা ভাবনা বিচিত্র চিন্তা। নববর্ষ উৎসবের রূপ-রূপান্তরের কথা ভাবতে ভাবতে আমার চেতনায় দেখা দিচ্ছে ভিন্ন এক ভাবনা। পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, নববর্ষ আমাদের শ্রেষ্ঠতম ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব। অতীতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাঙালি জাতি মিলিতভাবে নববর্ষ পালন করেছে, করছে এখনো। কিন্তু জাতীয় জীবনে এখনো দূর হয়নি সংকীর্ণ সম্প্রদায়চেতনা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। নববর্ষ উৎসবের অন্যতম শিক্ষাই হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও মিলিত জীবনচেতনা। কিন্তু বাংলাদেশে এক্ষেত্রে বিরাজ করছে এক বিশাল শূন্যতা। চারদিকে বিরাজ করছে হতাশা, নৈরাজ্য, অসহায়তা আর চরম নিরাপত্তাহীনতা। এ অবস্থা থেকে পহেলা বৈশাখ কি আমাদের মুক্তির কোনো পথ দেখাতে পারে?

ঔপনিবেশিক আমলে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন ছিল একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ। আজকে আবার ওই জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে নববর্ষ উদ্‌যাপন করা জরুরি। নববর্ষের মিলিত শক্তি দিয়ে দাঁড়াতে হবে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক চারিত্র্য অর্জনের কারণেই পহেলা বৈশাখ আমাদের কাছে এই দাবি নিয়ে হাজির হয়–যুদ্ধাপরাধীদের অবিলম্বে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোক। মহান মুক্তিযুদ্ধ পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে গোটা জাতিকে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। বাংলা ভাষা নিয়ে হালে যে বিতর্ক তৈরি হচ্ছে, প্রমিত ভাষাকে যেভাবে উদ্দেশ্যচালিত তাত্ত্বিক প্রচার করছেন 'সংস্কৃত বাংলা' বলে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। কর্পোরেট পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রসমূহে বাংলা ভাষার নানামাত্রিক ব্যবহার সৃষ্টি করছে বহুমুখী বিভ্রান্তি, বানানরীতিতে মানা হচ্ছে না ব্যাকরণের নিয়ম-রীতি, বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে বেতারে প্রচারিত হচ্ছে উদ্ভট জগাখিচুড়ি ভাষার অনুষ্ঠান, টিভি-নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার নিয়ে চলছে এক মহোৎসব–এসব প্রবণতার বিরুদ্ধে পহেলা বৈশাখের চেতনায় মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ানো প্রয়োজন। শিক্ষা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চলছে চরম ইংরেজি-প্রীতি–দেখে-শুনে মনে হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা নয়, ইংরেজি। কখনো কখনো মনে হয়, বায়ান্নর সেনানীদের মতো আমাদের কি আবার দাবি তুলতে হবে–'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' চাই, 'বাংলার প্রকৃত রাষ্ট্রায়ণ চাই।

আমাদের চারধারে এখন এমন সব প্রবণতা চলছে, যা সুকৌশলে ঐতিহ্য থেকে বাঙালিকে উন্মূলিত করার অপপ্রয়াসের নামান্তর। অথচ আমরা তো জানি, পহেলা বৈশাখ মানে বাঙালির ঐতিহ্য-অন্বেষা, পহেলা বৈশাখ মানে বাঙালির আপন শিকড়-অন্বেষা। পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উদ্‌যাপনকে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে না দেখে, দেখতে হবে ঔপনিবেশিক আমলের মতো রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে। রবীন্দ্রনাথকে স্বরণ করে বিষ্ণু দে একটি কাব্যের নাম রেখেছেন 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'। বিষ্ণু দে-র অনুসরণে আমাদেরও বলতে ইচ্ছা হয়–'তুমি শুধু পহেলা বৈশাখ?' না, পহেলা বৈশাখ কেবলই পহেলা বৈশাখ নয়। এই বৈশাখের বুকের ভিতরে আছে আগুন–প্রতিরোধের আগুন। কেবল সাংবাৎসরিক নববর্ষ উদ্‌যাপন নয়, ওই প্রতিরোধের আগুনসম্ভব পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনই হোক নববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার।

আমাদের সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ধর্মিতা, আমাদের সংস্কৃতির মূল শক্তি সজ্ঞচেতনা। কিন্তু পঞ্জিকা সংস্কারের ফলে এক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ভিন্ন এক ভেদরেখা। এই বৈশাখে আমাদের ভাবনায় দেখা দেয় এই কথা–বাঙালি এখন নববর্ষ পালন করে দুটি ভিন্ন দিনে। এই ভিন্নতা কীভাবে দূর হবে? এ ভিন্নতা তো নববর্ষের মৌলচেতনার পরিপন্থী। নববর্ষের এই শুভার্থী মুহূর্তে আমাদের ভাবনা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী–উঠে আসুক কেন্দ্রে, উত্থান ঘটুক প্রান্তজনের। গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার জন্য ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হোক, বিস্তৃত হোক আমাদের নববর্ষের চেতনা, বিকশিত হোক বাঙালির আবহমান মিশ্র সংস্কৃতি।

দেশের বর্তমান দুরবস্থা ও নানামাত্রিক বিপন্নতা থেকে উত্তরণের আশা নিয়ে পুবদিকে উঠেছে ১৪৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম সূর্য। এই বৈশাখ আমাদের কাছে আসুক দুরবস্থা উত্তরণের সৃষ্টিশীল বিকল্পের উৎস হয়ে। বহুবিধ বিপর্যয় ও বিপন্নতার মধ্যেও এই বৈশাখে আমরা মিলিতভাবে আশায় বুক বাঁধি বহুশ্রুত এক মিথ-কাহিনির অনুষঙ্গে। মিথ-কাহিনির সেই ফিনিক্স পাখিই আপন দেহভস্ম থেকে যে আবার জেগে উঠতে পারে সপ্রাণ সত্তায়–আমাদের রক্ষা করবে। বাংলাদেশের জনগণের মাঝেই আছে ফিনিক্স পাখির সেই জেগে ওঠার শক্তি। তাই তারাই এদেশের অগ্রযাত্রায়, উন্নত সমাজ-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, বৈশাখীচেতনা বিস্তারে, শেষ প্রতিরোধ, অন্তিম ভরসা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ ॥ লেখক-গবেষক। সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪০ সালের নববর্ষে, জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জ

প্রচ্ছদপ্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন ও বর্ষবরণ

দীপংকর গৌতম

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির চিন্তা চেতনায় যতোটা গভীরভাবে ছাপ ফেলেছে এতটা অন্য কেউ পেরেছে বলে মনে হয় না। তার কারণ হয়তো এমন যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন মূর্তমান দিক রয়েছে, তেমনি আছে বিমূর্ত দিকও। রবীন্দ্রনাথের শব্দ ও বাক্য সবকিছুরই ভিন্ন রকমের ব্যাপ্তি আছে। একধরনের মুক্তি মেলে তার বাণী-সুরে। রবীন্দ্রনাথের অন্যরকম এক প্রকাশ আছে, যা হৃদয়স্পর্শী। জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে তার আবাহন আছে। যা মানুষকে আশ্রয় দেয়, ভাসিয়ে রাখে। রবীন্দ্রনাথের ভেতরে যেমন আধ্যাত্মবাদী দর্শনের প্রভাব আছে তেমনি রিয়েলেস্টিক ধারাও যে নেই, তা বলা যাবে না। এমন একজন বিশ্বমানের লেখকের বহুমাত্রিক দর্শনের প্রভাব থাকবে এটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মননে অনুভূতির এমন অনুরণন তোলে যা আমাদের দেশপ্রেম, মানবপ্রেমকে দৃঢ় করে তোলে। সবকিছুর ভেতরেও সমস্যা সংকটে রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় মেলে। তাই বারবার ছুটে যেতে হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে।

১৯৪০ সালের নববর্ষে, জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে

বাঙালির মননে রবীন্দ্রনাথ এতোটাই প্রভাব ফেলেছিল যে, পাকিস্তানিরা প্রথমে বাঙালির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথকেই টার্গেট করে নিষিদ্ধ করে। এমন কবি বিশ্বে আর কে আছেন যাকে কেন্দ্র করে একটি দেশের স্বাধিকার আন্দোলন গতিশীল হয়েছিল? তাই রবীন্দ্রনাথের পথেই বাঙালির পথ চলা–একথা সবাই মানবেন এমন না। পাকিস্তানের রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতা এখনো কি নেই? আছে। ভিন্ন পোশাকে, ভিন্ন আঙ্গিকে তবে বিষয় এক। আমাদের বাংলা নববর্ষ বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম এক উপাচার। নববর্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'প্রতিটি মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী। কিন্তু উৎসবের দিন মানুষ যতোটা বৃহৎ, সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া আরো বৃহৎ, সেদিন সমস্ত মনুষত্বের শক্তি অনুভব করিয়া বৃহৎ।'

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের দিনে বাঙালিরা যে উৎসব করে, সেদিন সমস্ত বাঙালি একাকিত্ব ভুলে বৃহৎ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। শহর-গ্রাম, ধনী-দরিদ্র, নির্বিশেষে সাদা-লালে রঙিন হয়ে ওঠে। কবিগুরুর নিজের আবির্ভাব বৈশাখে। ফলে গ্রীষ্মের প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপ সত্ত্বেও বৈশাখের রুদ্ররূপ কবির বড়ো প্রিয়। তাই 'নববর্ষ' যাপনকে কবি রূপ দিলেন নবোচ্ছ্বাসের আগমনীতে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম নববর্ষ আসে (১২৬৯ বঙ্গাব্দ ১৮৬২ খ্রি.) জন্মের পর মাত্র দ্বিতীয় বছরে পা দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম দিনগুলোতে পয়লা বৈশাখ বা বর্ষবরণ তেমন জাঁকজমকভাবে পালিত হয়নি। তারপর অনেক পরে জীবনের তেইশ বছর বয়সে (১২৯০ বঙ্গাব্দ) প্রথম বর্ষবরণের সূচনা হয় মহর্ষি ভবনে নববর্ষের উপাসনা দিয়ে। এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হয়, 'সখা তুমি আছ কোথা' ও 'প্রভু এলেম কোথায়'। এ গান দুটির বিশেষ তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মসংগীত রচনার সূত্রপাত আগে হলেও নববর্ষ উপলক্ষে তিনি এই প্রথম গান রচনা করলেন। সেদিক দিয়ে গান দুটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এরপর প্রায় প্রতিবছরই বর্ষশেষ ও বর্ষবরণ উৎসব পালিত হতে থাকে।

শান্তি নিকেতনে প্রথম নববর্ষ উদ্‌যাপন

(১ বৈশাখ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, ১৯০২ খ্রি.) শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম বৎসরের নববর্ষের উৎসবটি সমারোহসহ অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গাব্দ ১৩০৯ সালে যেটা ইংরেজি ১৯০২ খ্রি.। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে বিভিন্ন বন্ধুজনকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেছিলেন। সকলে না হলেও অনেকে যে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সেকথা জানিয়েছেন জগদানন্দ রায় :

'প্রথম বৎসরের উৎসবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি অনেক অতিথি আসিয়াছিলেন!! শ্রদ্ধাস্পদ মোহিতচন্দ্র সেন বোধ করি সেই উৎসবেই আশ্রমে প্রথম আসিয়াছিলেন!! বেশ মনে পড়ে লাইব্রেরির মাঝের বড় ঘরটিতে সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন এবং পাশের ঘরে জলযোগের আয়োজন হইতেছিল!! গুরুদেব 'আমারে কর তোমার বীণা' গানটি গাহিলেন; সকলে অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন!! তার পরে পশ্চিমে মেঘ করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় আসিল!! মোহিতবাবু এবং আরো অনেকে ঘর ছাড়িয়া সম্মুখের মাঠে দাঁড়াইলেন! মোহিতবাবু ঝড়ের প্রতিকূলে যে প্রকারে দৌড়াইতেছিলেন তাঁহার ছবি এখনো চোখে ভাসিতেছে।'

নববর্ষ উপলক্ষে কবিগুরুর প্রথম বক্তৃতা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ছাব্বিশ বছর তখন তিনি নববর্ষ উপলক্ষে প্রথম বক্তৃতা করেন (১ বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৯৩, ১৮৮৬ খ্রি.)। মহর্ষিভবনে নববর্ষের উপাসনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সেদিন তিনটি গান রচনা করেন, সেগুলি 'নববর্ষের গান' শিরোনামায় তত্ত্ববোধিনীর বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। গানগুলি ছিল : ১। আমাকে করো মার্জনা। ২। বর্ষ গেল বৃথা গেল কিছুই করিনি হায়। ৩। ফিরোনা, ফিরোনা আজি, এসেছ দুয়ারে। এইদিন ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে সিটি কলেজ গৃহে 'নববর্ষ' উপলক্ষে কয়েকটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে 'সত্য' শীর্ষক ভাষণটি পাঠ করে বলেন, 'সরলরেখা আঁকা সহজ নহে, সত্য বলাও সহজ ব্যাপার নহে। সত্য বলিতে গুরুতর সংযমের আবশ্যক। দৃঢ় নির্ভর দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তোমাকেই সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে, সত্য তোমার অনুসরণ করিবে না।' তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত শান্তিনিকেতনে বর্ষবরানুষ্ঠানের দৃশ্যপট ছিল এমন যে, সকাল সাতটায় শান্তিনিকেতনে সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক, কর্মী ও আশ্রমবাসীদের উপস্থিতিতে মন্দিরে উপাসনা হয়। বৈতালিক গীতি 'ভেঙেছো দুয়ার এসেছো জোতির্ম্ময় তোমারি হউক জয়' গাইতে গাইতে পরিক্রমা শুরু হয়। সুরের মুর্চ্ছনায় মুখরিত শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি অপরূপ হয়ে ওঠে। শাল ফুলের ঝালর ঝুলিয়ে রয়েছে শালবিথী। রাঙামাটির পথে বকুলবিথীর ঝরা বকুল ফুলে যেন আঁকা হয় মনোহর আল্পনা। আল্পনা যে নিছক আল্পনা নয়, এটাও যে বাঙালির লোকায়ত সংস্কৃতির অনন্য উপাচার সেটাও প্রকাশ করে আল্পনা। শান্তিনিকেতনে রঙে রঙে রাঙিয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া বৈশাখ ও রঙিন উৎসবের আবহ যেন তৈরি হয়ে থাকে। গ্রীষ্মেও প্রচণ্ড দাবদাহে শান্তিনিকেতনের লাল মাটি যেন সিঁদুরে মেঘের রূপ ধরে। রুক্ষ, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে ভয়ংকর শক্ত হয়ে ওঠে। তপ্ত মাটি জল চায়। সমস্ত কুয়োর জল শুকিয়ে কাঠ, কোথাও এক বিন্দু জল চোখে পড়ে না। সাঁওতাল কৃষকের জীবন যেন অসার হয়ে আসতে চায়। গ্রীষ্মেও এই দাবদাহে জীবনের শ্রান্তির জন্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মবকাশ চালু করেছিলেন ১ মে থেকে দুমাসব্যাপী। কিন্তু শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, কর্মী-অধ্যাপকদের অনুরোধে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ (১৯৩৬ খ্রি.) থেকে বর্ষবরণের পাশাপাশি তার জন্মোৎসব পালনের অনুমতি দেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী তার 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে লিখেছেন–'২৫ বৈশাখ তো হয় ৭/৮ মে। তখন গরমের ছুটি হয়ে যায়। তাই গরমের ছুটি হবার আগেই আম্রকুঞ্জে প্রভাতে আশ্রমিকরা রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করতেন। আমরা,

ছোটরা। প্রথম সারিতে বসতাম।–দিনটি ছিলো ১ বৈশাখ।.. মে মাসে আশ্রমে জলাভাব। তাই নাচে গানে কবিতায় সেদিন জন্মদিনও পালিত হতো। যাঁর জন্মদিন তিনি ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি আর উত্তরীয় সেজে গাড়ি থেকে নামতেন। কী রূপ, যেন ঝলমল করতো আম্রকুঞ্জ।' শান্তিনিকেতনে পয়লা বৈশাখে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে কবিগুরুর জন্মোৎসব পালিত হয়েছে সুদীর্ঘকাল। অবশ্য কবিগুরুর ১২৫তম জন্মদিনে ১৩৯২ বঙ্গাব্দে (১৯৮৫ খ্রি.) ২৫ বৈশাখ শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল। ১৪১২ বঙ্গাব্দ (২০০৫ খ্রি.) থেকে শান্তিনিকেতনে ১ মের পরিবর্তে ১৫ মে থেকে গ্রীষ্মেও ছুটি চালু হয়। সেকারণে উক্ত বছর থেকে পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এবং রবীন্দ্র জন্মোৎসব নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বা বর্ষবরণ উৎসবকে নতুন রূপে রূপায়িত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এই বর্ষশেষের শুভসন্ধ্যায় হে নাথ তোমার ক্ষমা মস্তকে লইয়া সকলকে ক্ষমা করি।...আগামী বর্ষে যেন ধৈর্যের সহিত সর্বদা সর্বত্র সঞ্চরণ করি।' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন নববর্ষ হচ্ছে সম্বৎসরের ছিন্নভিন্ন বর্মকে খুলে নতুন বর্ম পরে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার দিন। শান্তি নিকেতন আজও তারই প্রবর্তিত সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে বর্ষবরণের ধারা রক্ষা করে চলছে। সাধারণত যেভাবে শান্তি নিকেতনে বর্ষবরণ পালন হয় সেটা খুবই বর্ণাঢ্য। খরা দাহে তপ্ত শান্তি নিকেতনের উষর প্রান্তর বৈশাখী আবাহনে যেন ভিন্ন রূপে সেজে ওঠে। বাঙালির নববর্ষ উৎসবের শুরু চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বিধায় এখানে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান সাধারণত শুরু হয় চৈত্রসংক্রান্তির দিন। পুরনো বছরকে বিদায় জানাতে জহরবেদিতে সাদা আলপনা দেয়ার পরই নতুন বছরকে বরণ করে অভ্যর্থনাস্বরূপ সেই আলপনাকে রঙিন করে তোলার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বর্ষবরণ উৎসব। ভোর পাঁচটায় গৌরপ্রাঙ্গণে বৈতালিকের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এই বর্ষবরণ উৎসব। সকাল সাতটায় উপাসনাগৃহে হয় উপাসনা। সকাল নটায় ঘণ্টাতলায় বর্ষবরণের আসর বসে। গৌরপ্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় নৃত্যনাট্য। বিশ্বভারতীতে প্রথম নববর্ষ পালিত হয় ১৯৩৬ সালের ১৫ এপ্রিল। বাংলা ১৩৪৩ সালে। সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই চলেছে রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন। আগেই বলেছি, বাঙালি রবীন্দ্রনাথের পথেই চলে তার সংস্কৃতি, পালা-পার্বন নিয়ে।

বর্ষবরণ ও ভিন্ন চিন্তা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তি নিকেতনের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি ১৮৬৩ সালে আশ্রম হিসেবে এর যাত্রা শুরু। ১৮৮৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট–একটি অতিথিভবন, প্রার্থনা কক্ষ এবং ধর্মীয় সাহিত্যের জন্য নিবেদিত গ্রন্থাগারের সংস্থান করেছিলেন। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে শিশুদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় শান্তিনিকেতন স্কুল শুরু হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে এটি বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন স্কুল এবং বিশ্বভারতী মিলে গড়ে উঠেছে শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার সমগ্রতা। ১৮৬৩ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রম, ১৯০১ সালে স্কুল এবং ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলেও এগুলো আলাদা ও বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখান থেকেই ১৯০২ সালে প্রথম বর্ষবরণ শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে আমরা দেখি গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক বা বিক্রমাদিত্য শকাব্দ চালু করলেও মূলত ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মার্চ বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে 'বঙ্গাব্দ' বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিতি পায়। অর্থাৎ আকবরের সময়কাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন শুরু হয়। তখন প্রত্যেকে বাংলা চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সব খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে বাধ্য থাকত। এর পরদিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। এ উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হতো। পরবর্তীতে এই উৎসবটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, যার রূপ পরিবর্তন হয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। কিন্তু সেই আনুষ্ঠানিকতার ধারাবাহিকতায় পুন্যাহ বা হালখাতা এখনও রয়েছে। তবে চৈত্র সংক্রান্তিকে ঘিরে নীল পূজা, শিবের গাজন বা বান-বড়শি ফোঁড়া বোধকরি একধরনের লোকায়ত উৎসব–যা সম্রাট আকবরের আগেও ছিল। কিন্তু সম্রাট আকবরের সময়ে বর্ষবরণ হালখাতা বা কর আদায় দিয়ে শুরু হয়েছিল। কিন্তু শুধু আনন্দ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ বোধকরি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে ১৯০২ সালে শান্তিনিকেতনে শুরু হয়। এই বর্ষবরণে কোনো লেনদেন নেই। আছে বৈশাখকে বরণ–সব রোগ জরাকে বিদায় দিয়ে নতুনকে বরণের আহ্বান। এই চিন্তা ধারার প্রকাশ দেখা যায় ১৯৬৭ সালে ছায়ানটের বর্ষবরণ। তাহলে বর্ষবরণ কি শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে? এ ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা করা যেতে পারে।

পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের অলিন্দে ধ্বনিত হয় কবিগুরুর গান। পুরানো জরা দীনতাকে ঝেড়ে ফেলে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে সকাল থেকেই সারাদিন সে গানটি মানুষকে উজ্জীবিত করে আন্দোলিত করে। যে গান শুনে বাঙালিমানস আপ্লুত হয় বারবার। সেই গানটি "এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ/ মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা/অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।" এ গানের মধ্যে যেমন পুরানোকে বিদায় করে নতুনকে গ্রহণের আবাহন আছে একই সঙ্গে তার গানে তিনি বছর শুরুর প্রথম লগ্নে বাঁধা জয়ের অভিযাত্রায় ডাক দিয়েছেন সবাইকে, 'এসো, এসো, দলে দলে বাহির হয়ে পড়ো। নববর্ষের প্রাতকালে পূর্ব গগণে আজ জয়ভেরি বেজে উঠেছে। সমস্ত অবসাদ কেটে যাক জয় হোক তোমার, জয় হোক তোমার প্রভুর।' বোশেখের রুদ্ররোষে প্রকৃতির অবাধ নাচন কালবৈশাখীর দাপটে আকাশ ঘন কালো করা বজ্রপাতের শংকা ভুলে মানুষ যাতে চলতে পারে সে অভয়বাণী শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার গানে। পহেলা বৈশাখ বর্ষবরণের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈশাখকে আমাদের মাঝে উপস্থাপন করেছেন ভিন্ন রূপে ভিন্ন আবেশে। বাঙালি ঐতিহ্যের প্রাচীনতম ধারাবাহিকতায় বাউল, জারি, সারি আর কীর্তন আবহমান কাল ধরে চলে আসলেও রবির আবির্ভাবের পর বাঙালির বৈশাখ উদযাপন অনেকটা বদলে গেছে। পৃথিবীর বাঙালি যে যেখানে আছে তারা বর্ষবরণের সাথে নিজেকে একাত্ম করে বৈশাখের আনন্দধারায়। বৈশাখ এলে তাই বাঙালিরা অনুভব করে বর্ষবরণ উৎসবকে। অসাম্প্রদায়িক একটি সাংস্কৃতিক উৎসব কতটা শক্তিশালী হতে পারে সেটা পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণকে দিয়ে সবচেয়ে বেশি বোঝা যায়। 'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা' রবীন্দ্রনাথের গানের এ চরণের মধ্য দিয়ে বাঙালি যেন পরিশুদ্ধ হয়। যে কারণে আমরা দেখি কল্পনা কাব্যের বৈশাখী কবিতায় কবি লিখেছেন, 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গলা জটাজাল তপ্তক্লিষ্ট তপ্ত তনু মুখ তুলে বিষান ভয়াল কারে দাও ডাক হে ভৈরব হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।' কবিগুরু তার 'বলাকা' কাব্যের ছবি কবিতায় লিখেছেন, 'এই ধুলি / ধূসর অঞ্চল তুলি / বায়ু বয়ে ধায় দিকে দিকে/ বৈশাখে সে বিধবার আবরণ খুলি / তপস্বিনী ধরণীকে সাজায় গৈরিকে। বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মমাস। বৈশাখ বাঙালির বর্ষশুরুর লোকায়ত উৎসবের মাস। এ মাসে কাল ভৈরবের শক্তি নিয়ে প্রকৃতি আবির্ভূত হলেও রবীন্দ্রনাথ আর বৈশাখ যেন একে অন্যের পরিপূরক। বছরের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখ থেকে উৎসবে উদ্দীপনায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের পাথেয়। বৈশাখ এলেই তাই আসে রবীন্দ্রনাথ। চেতনায়, অন্তরে, অন্দরে তার গভীর ছায়াসম্পাত টের পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনে বর্ষবরণে তার প্রতিভাস শুরু থেকে আজ অবধি বিদ্যমান। আজ বাংলাদেশের ভেতরে বাইরেও বর্ষবরণের উৎসবের বিশালত্ব বাড়ছে। শান্তিনিকেতনসহ কলকাতার বাইরেও মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হচ্ছে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। উৎসবের এই ধারা অব্যাহত থাকবে কাল থেকে মহাকাল জুড়ে। মানুষের সমস্যা-সংকটে রবীন্দ্রনাথ যেহেতু আশ্রয় সেহেতু রবীন্দ্রনাথের পথ ধরেই চলবে উৎসবের এই অনিন্দ্য আয়োজন।

দীপংকর গৌতম ॥ কবি ও সাংবাদিক

তথ্যঋণ
১. রবীন্দ্রজীবনকথা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। রবিজীবনী প্রশান্ত কুমার পাল।
২. রবীন্দ্র-জীবনে নানা নববর্ষের গাঁথামালা ॥ ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত
৩. আমার শান্তিনিকেতন-মহাশ্বেতা দেব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কাজী আবদুল ওদুদের বিবেচনায়

মিজান টিটু

জ্ঞান ও যুক্তি চর্চা বুদ্ধিজীবিতার লক্ষণ। বুদ্ধিজীবিতা সমাজের সংস্কার ও চিন্তার মুক্তির মধ্যে সমন্বয় ঘটায়। এই ভাবনার আরও সার্থক প্রয়োগ, যেখানে বলা হয় 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। ১৯২৬ সালে এই মন্ত্র নিয়েই ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক সংকট, ধর্মান্ধতা ও অশিক্ষা দূর করা। যদিও নামকরণে মুসলিম সাহিত্যসমাজ, এই সংগঠনের সভ্য ছিলেন সকল ধর্ম-গোত্রের মানুষ। কাজী আবদুল ওদুদও মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর সভ্য ছিলেন এবং বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনে একাত্ম হন। এই সংগঠনে কাজ করার প্রেক্ষিতেই তিনি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ভাবনা সকলের কাছে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সম্ভব হয়ে ওঠেনি বেশিদিন, সংগঠনটির রাজনৈতিক ও চিন্তার আড়ষ্টতার কারণে।

কাজী আবদুল ওদুদ

বুদ্ধি ও জ্ঞান চর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ কাজী আবদুল ওদুদকে আরও সচেতন করায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ নিয়ে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রবন্ধে তিনি অকপটে বলেন, কিন্তু অচিরে ব্যাপকভাবে মুসলমান সমাজ থেকে এর প্রতি বিরোধিতা এমন প্রবল হলো যে, যোগ্যভাবে কাজ করবার সুযোগ এর লাভ হলো মাত্র পাঁচ বছরের জন্য। এই সমাজ অবশ্য সক্রিয় ছিল আরও দীর্ঘ দিন। এর দুই একজন সাহিত্যিক আজো একান্ত রত রয়েছেন সাহিত্য সেবায়। কিন্তু ব্যাপকভাবে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজে এঁদের প্রভাব আজ কম। এদের 'বুদ্ধিও মুক্তি'র মন্ত্রের পরিবর্তে বাংলার মুসলমান সমাজ আজ ব্যাপকভাবে নিতে চাচ্ছেন 'আত্মনিয়ন্ত্রণে'র মন্ত্র। (আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ওদুদ)

কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন প্রগতিপন্থী, আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের। রাজনীতিসচেতন কাজী আবদুল ওদুদের আত্মপ্রকাশ ঘটে বহুমাত্রিক লেখক ও চিন্তক হিসেবে। ওদুদ পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না, নিজের পরিচয় ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদী হিসেবে দিতে পছন্দ করতেন এবং তিনি আমৃত্যু লড়াই করেছেন প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে। ওদুদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও তার চিন্তার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতেন উনিশ শতকের অগ্রণী সাহিত্যিক ও চিন্তক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার লেখায় এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তিনি ভারত মাতাকে ইংরেজদের শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি হিন্দু সমাজের চিন্তার বহুমুখী জাগরণের স্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় বঙ্কিমকে। ওদুদ, বঙ্কিমের প্রতিভা এবং একটি সম্প্রদায়ের জাগরণের স্রষ্টা হয়ে ওঠাকে ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্নভাবে। সাধারণ দেশবাসীর জায়গা থেকে যখন ওদুদ বিষয়টিকে দেখছেন, চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র লোকান্তরিত হন। এই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকালে তাঁর প্রতিভা এক বিশেষ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর দেশবাসীর সামনে। তাঁদের একদল তাঁকে ভাবছেন দানব, অপর দল ভাবছেন দেবতা। এই পূজা ও ঘৃণা পরস্পরের রসের জোগান যেভাবে স্ফীতি লাভ ক'রে চলেছে তা অদ্ভুত।

(বঙ্কিমচন্দ্র, শাশ্বত বঙ্গ)

কাজী আবদুল ওদুদ বিষয়টিকে সাধারণভাবেই দেখতে আগ্রহী এবং তিনি মনে করতেন যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে কবি সাহিত্যিক বা জ্ঞানব্রতী যারা, তাদের ভাগ্যে এমন বিড়ম্বনা ঘটে। ওদুদের মতে বঙ্কিমের দুটি বিষয় লক্ষণীয়, কেউ কেউ মনে করেন, বঙ্কিমের ভেতর মুসলমান বিদ্বেষ ছিল। যদিও ধারণাটি সঠিক নয়। কেননা বঙ্কিম সাহিত্যে মীরকাসেম, দলনী বেগম, বাদশা-ফকির, ওসমান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মুসলমান চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন। একথাও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার বঙ্কিম তার বঙ্গদেশের কৃষক ও সাম্যে যেসব চরিত্র অঙ্কন করেছেন বা যাদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন তারা সবাই জাতিধর্মনির্বিশেষে দুস্থ। দ্বিতীয়ত ওদুদ মনে করেন, বঙ্কিমের মুসলমান নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের অপরাধ না থাকলেও হিন্দু নামে আর একটি সম্প্রদায়ের ভালোর জন্য তাঁর মাত্রাতিরিক্ত উৎকণ্ঠা প্রতিভাবান হিসেবে সেটি তার একটি অপরাধ। অর্থাৎ, বঙ্কিমের কাছে সকল গোত্র-ধর্মের মানুষের কামনা স্বজন বাৎসল্যের চেয়ে উঁচুদরের জিনিস–তার নাম সত্যাশ্রয়িতা আর মানবতা। তবে আনন্দমঠের হিন্দু পুনরুত্থান এর ধারা প্রকাশ পায় যার জন্য তিনি অনেক নিন্দিত ও স্তুতি পেয়েছেন সেখানে বঙ্কিমের একটি স্বতন্ত্র মত ছিল, তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা অপকৃষ্ট লৌকিক ধর্ম... হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক। এখানে তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে এই পর্যন্ত বঙ্কিমের বক্তব্যের সাথে বিরোধ নেই হিন্দু ধর্মের মতানুসারীদের কিন্তু যখনই তিনি বলছেন সে একটা অপকৃষ্ট লৌকিক ধর্ম তখনি হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেননি, বঙ্কিম হয়ে উঠলেন অনেকের অনাত্মীয়। এই পুরো বিষয়টিকে ওদুদ চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর (বঙ্কিম) যুগে সভ্যজগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তিতে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন তাঁর চারপাশের লোকদের ভাবালুতা, স্পষ্ট নির্দেশ দিতে চেয়েছিলেন তাদের জাগতিক জীবনে শ্রেয়োলাভের-চিরকালই কর্মী ও চিন্তাশীলেরা যা করে থাকেন। (বঙ্কিমচন্দ্র, শাশ্বত বঙ্গ)

বঙ্কিমের এই হিন্দুত্ববাদিতা সমাজের প্রচলিত হিন্দুত্ব থেকে অনেক দূরবর্তী। ধর্ম নিয়ে তার একধরনের উপলব্ধি তৈরি হয়েছিল যার নাম নব-হিন্দুত্ব। ওদুদ বিষয়টিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব নামক প্রবন্ধে বলেছেন, বঙ্কিম তাঁর ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থে চিন্তার যে মৌলিকতা প্রকাশ করেছে, তার নাম নব-হিন্দুত্ব না দিয়ে তাঁর স্বদেশবাসীদের জন্য নব মানবতাবাদ বা নব জাতীয়তাবোধ দেওয়াই সঙ্গত। এক্ষেত্রে বঙ্কিমের সুবিখ্যাত উক্তিটি ওদুদ স্মরণীয় মনে করেন, নিচে উক্তিটি দেওয়া হলো, এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরুপণের জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি, যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি, এই পরিশ্রম, এই কষ্ট-ভোগের ফলে এইটুকু বুঝিয়াছি যে সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সে ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।

অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র আসলে মানুষের মুক্তি ও তার উৎকর্ষ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে চেয়েছেন, যা ধর্মকে ছাপিয়ে মানবতাবাদে রূপান্তরিত হয়। ওদুদের মতে, বঙ্কিমচন্দ্র যে মূলত জ্ঞানব্রতী মানব-বন্ধু এই দিক থেকে বলা যায়, তাঁর হিন্দুত্ব মানবত্ববোধের একটি নাম মাত্র।

এই বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে বিবেচনা করা যায়, যেমন বঙ্কিম যখন লিখছেন তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেত বেশি, মুসলিমসম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষা থেকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণেই অনেক দূরে অবস্থান করত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে একধরনের উপলব্ধি তৈরি হলো, ইংরেজ শাসন বাঙালি আত্মসত্ত্বাকে বিনষ্ট করে তাদের শাসনতন্ত্রকে দীর্ঘস্থায়ী করার আয়োজন করছে। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটা জাতীয় চেতনা তৈরি হয় যেটাকে আমরা জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাথমিক উন্মেষপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। তবে এই জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে মুসলমানরা খুব সহজেই বাদ পড়ে যায়, কারণ ইউরোপীয় শিক্ষার অভাব অন্যদিকে মুসলিমদের অতীত ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি, ইংরেজদের কাছে

ক্ষমতা হারানোও গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে। এসব কারণে হিন্দুদের প্রতিপক্ষ মুসলিমরা হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যারা ইংরেজদের ক্ষমতাকাঠামোর অভ্যন্তরে চিন্তা করত। ফলে ঐ সময়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা মূলত বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেই রাজনৈতিকভাবে জোরালো আকার ধারণ করে। আর বঙ্কিম তখন এই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। অথচ এই ক্ষেত্রে বঙ্কিম সচেতন থাকলে হতে পারতেন ভারতবর্ষের সকলের পূজনীয়। কিন্তু বঙ্কিমের রাষ্ট্র কাঠামো ভাবনা ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দর্শন শেষ পর্যন্ত অনেকটা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্পূরক হয়ে উঠছিল। এ প্রসঙ্গে আহমদ ছফা'র মন্তব্য নেওয়া যেতে পারে, বঙ্কিম ছিলেন আধুনিক বাংলা তথা ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবেত্তা। তিনিই সর্বপ্রথম একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্কিম ধর্মচিন্তা, সংস্কৃতচিন্তা, ইতিহাসচিন্তা, বিজ্ঞানচিন্তা এবং সাহিত্যচিন্তা সব ধরনের চিন্তাপ্রবাহের গতিমুখ রাষ্ট্রচিন্তার মূল বিন্দুকে ঘিরে বিকশিত করেছেন। রাষ্ট্রচিন্তাই তাঁর মুখ্য মনোযোগের বিষয়। অন্যবিধ চিন্তাসমূহকে রাষ্ট্রচিন্তার সহায়ক চিন্তা হিসেবে তিনি দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর ছিল একমুখী মন। যাই লিখুন না কেনো একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁর মনে কম্পাসের কাঁটার মতো হেলে থাকতো। (শতবর্ষের ফেরারি : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আহমদ ছফা)

সুতরাং, বঙ্কিমের সাহিত্যভাবনাও রাজনৈতিক চিন্তা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ছিল, আলোচনার সুবিধার্থে বঙ্কিমের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস আনন্দমঠ নিয়ে আলোচনা করা যাক, আনন্দমঠ উপন্যাসটি শুধু সাহিত্যের বিচারে কেমন সেই হিসেবে বিবেচিত হলে দুর্বল উপন্যাস হিসেবে পরিচিতি লাভ করত। কিন্তু এই উপন্যাসের সার্থকতা হলো, একটি রাজনৈতিক বীজ সফল ও সচেতনভাবে বোপন করা হয়েছিল যা পরবর্তীতে ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা তৈরিতে সরাসরি ভূমিকা পালন করে। এই উপন্যাসে দেশকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতীকে আবদ্ধ করা হয় ফলে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা অর্জন হয়ে ওঠে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, ভবানন্দ যখন মহেন্দ্রকে আনন্দমঠে নিয়ে আসেন এবং সত্যানন্দ তাকে মাতৃরূপ (স্বর্গীয় দেবী ভাবনা থেকে উৎসারিত) দর্শন করান, তখন মায়ের তিনটি রূপ মহেন্দ্রর কাছে তুলে ধরেন,

প্রথমত জগদ্ধাত্রী–যে রূপে মা সবাইকে রক্ষা ও লালন করে, পরবর্তী রূপ হিসেবে মা'কে দেখানো কালী রূপে, যেখানে মা প্রতীয়মান হচ্ছে অভাব-অন্ধকারের সমরূপ হিসেবে (ইংরেজদের শোষণে মায়ের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়)। সর্বশেষ মাকে দেবী দুর্গা'র সাথে তুলনা করা হয় যার ফলে মা হবেন যুদ্ধংদেহি। অর্থাৎ ইংরেজদের থেকে ভারতবর্ষের মুক্তির পথ কিংবা ইংরেজরা যে কালিমালেপন করেছেন তা মোচন করতে তার সন্তানেরা মহাসংগ্রামে লিপ্ত হতে চায়। এই উপন্যাসে বন্দেমাতরাম নামে একটি গান ব্যবহার করা হয় যা পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা দলের গান হয়ে ওঠে। আসলে বঙ্কিমের মনোযোগ বিশুদ্ধ হিন্দুবাদীতার দিকে থাকলেও সর্বসাধারণের কাছে এটা শেষ পর্যন্ত সাধারণ হিন্দুত্ব হিসেবেই ধরা দিয়েছিল। তবে উপরে উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে ড. আহমদ শরীফের বক্তব্য গ্রহণ করা যেতে পারে যা কাজী আবদুল ওদুদের চিন্তার সাথে অনেকটা মিলে যায়, হিন্দু-মুসলমান কি কোনোকালে একজাতি ছিল যে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়া যাবে? বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিজাতি-বিদ্বেষী। সাধারণভাবে বিচার করলে এতে অন্যায়-অস্বাভাবিকতা কিছুই পাওয়া যাবে না। কেননা বঙ্কিম যে মুসলমানকে গাল দিয়েছেন, তারা তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠী। যে বিদেশী বিজাতি ও বিধর্মী এদেশে চেপে বসল আর দেশবাসীর স্বাধীনতা ও সম্পদ কেড়ে নিল, তাদের প্রতি বিরূপ থাকাই তো স্বাভাবিক ও শোভন। সহজাত এই বিরূপতা দেশী মুসলমানের গায়েও লাগল, কেননা ধর্মীয় ঐক্যসূত্রে এবং আভিজাত্যবোধে দেশী মুসলমানেরাও নিজেদের তুর্কী-মুঘলের জ্ঞাতি ভাবতে শিখছে। যেমন দেশী খ্রীস্টানরা স্বজাতি ভেবেছে ইংরেজকে। শাসক-শাসিতের পূর্ব সম্পর্ক স্মরণ করে উনিশ শতকের হিন্দু লেখকমাত্রই মুসলমানের প্রতি কমবেশি বিরূপতা দেখিয়েছেন। সে-বিরূপতা বিদ্বেষ ও বিদ্রুপ-রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি মধুসূদনের মতো সংস্কারমুক্ত প্রতিভাও এ দোষ থেকে মুক্ত নন। তার প্রহসন মিয়াজান ও কৃষ্ণকুমারী নাটকে যবন অপহৃতা

বঙ্কিমের রাজনৈতিক দর্শন সাহিত্যিক জীবনেও প্রভাব ফেলে এবং ওদুদ বঙ্কিমকে একরৈখিক সমালোচনায় আবদ্ধ করেননি। লোকশ্রুত, বঙ্কিমের সাহিত্যিক অবস্থান কী তাও তুলে ধরছেন তার লেখনির মাধ্যমে। বঙ্কিমপ্রতিভা প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচকদের তিনটি বড় দলে ভাগ করেছেন।

পদ্মিনী প্রসঙ্গ স্মত। তবু অন্যদের কথা আলোচ্য নয় এজন্য যে তাঁরা কেউ প্রভাবশালী ছিলেন না। কিন্তু বঙ্কিম যুগ স্রষ্টা প্রতিভা বলে স্বীকৃত। কাজেই তাদের পক্ষে এ অনুদার ও অবিজ্ঞজনোচিত মনোভাব দূষণীয়। (বঙ্কিম মানস, আহমদ শরীফ)

অর্থাৎ বঙ্কিম প্রতিভা পারিপার্শ্বিকতা ও তার সময়ের রাজনৈতিক ভাবনায় তাড়িত হয়, যেহেতু তখনও অখণ্ড জাতীয়তাবাদ তৈরি হয়নি, তাই হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকেই তার সমর্থন গেল। অন্যদিকে পুরোপুরি ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বলে, বঙ্কিম সহজেই প্রগতিবাদী জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন, এই প্রগতিবাদিতা তার সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তবে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে প্রগতিবাদিতা পেলেও, ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে এখানকার মানুষকে শোষণ করায়, তাদের বিরুদ্ধচারণের কৌশলও বঙ্কিম বের করেন লেখনির ভিতর দিয়েই। বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তর তারই সচেতনতার প্রয়াস বলা যায়। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী চিন্তা, সমাজ নিরীক্ষণ, সাম্প্রদায়িকতাকে ছাড়িয়ে যান যখন তিনি বলেন, তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধী কিন্তু ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত তবে পুষ্প সুগন্ধী হইত না- ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও। (কে গায় ওই, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বঙ্কিমের রাজনৈতিক দর্শন সাহিত্যিক জীবনেও প্রভাব ফেলে এবং ওদুদ বঙ্কিমকে একরৈখিক সমালোচনায় আবদ্ধ করেননি। লোকশ্রুত, বঙ্কিমের সাহিত্যিক অবস্থান কী তাও তুলে ধরছেন তার লেখনির মাধ্যমে। বঙ্কিমপ্রতিভা প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচকদের তিনটি বড় দলে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে একদল বঙ্কিমকে ভারতীয় বা এশিয়ার আধ্যাত্মিক আদর্শের নমুনা হিসেবে দেখছেন, আরেকদল শুধু বঙ্কিমের সাহিত্যিক প্রতিভা বিবেচনা করতে বেশি আগ্রহী, তৃতীয় দল বঙ্কিমকে নিয়ে স্পষ্ট কোনো মতামত দিতেই আগ্রহী নয়। তবে বঙ্কিমের আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মজীবন ভাবনায় পরিলক্ষিত হয় সমুদয় বৃত্তির ঈশ্বরমুখী হওয়ার নামই ধর্ম, যেখানে শান্তি বিরাজ করে। এক্ষেত্রে সাহিত্যিক বঙ্কিমের উপন্যাস যখন পর্যালোচনা করি তখন সমুদয় শান্তির সন্ধান আমরা পাই না ঈশ্বরমুখী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে দুঃখবোধ, নৈরাশ্য ও অশান্তি। অর্থাৎ সত্যিকারের সাহিত্যিক চেতনা থেকে তিনি সরে আসেননি আর বঙ্কিমের সাহিত্যিক বৈভব যথেষ্ট থাকায় সাহিত্যমোদীরাও আকৃষ্ট হয়েছেন অনায়াসে। যেমন, রাজসিংহ উপন্যাসের জেবুন্নেসা, চন্দ্রশেখরের শৈবালিনী কিংবা আনন্দমঠের ভবানন্দ চরিত্র নেতিবাচক হতে পারে কিন্তু সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসেবে অনেক বেশি গৌরবময়, এজন্য বলা হয় হিন্দুত্বের আড়ম্বর থাকলেও তার সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য হলো মানবতা। এই মানবতার বয়ান কাজী আবদুল ওদুদের বিবেচনায়...

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর একালের দেশবাসীদের রয়েছে নিবিড় ভক্তি আর উৎকট বিদ্বেষের কথা। আমাদের বিশ্বাস, কালে তাঁর পূজারী আর বিদ্বেষী দুই দলই বিলুপ্ত হবে, কেননা দুয়েরই উপজীব্য অজ্ঞানতা-সত্য হবে তাঁর প্রতিভার জন্য তাঁর প্রতি তাঁর সাহিত্যের পাঠকবর্গের শ্রদ্ধা। প্রতিভাবান অভ্রান্ত নন একথা তাঁরা বুঝবেন, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তাঁরা বুঝবেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রতিভাবান পরম বরণীয়–বিধাতার দান–তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতিও একান্ত অর্থহীন নয়। (বঙ্কিমচন্দ্র, শাশ্বত বঙ্গ)।

মিজান টিটু ॥ কবি ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

ধামাইল সংস্কৃতিতে নারী

জয়শ্রী সরকার

উঠানের মাঝখানে আল্পনা আঁকা মাটির পাঁচটি কলসি। কলসির মুখে সিঁদুরের ফোঁটাবেষ্টিত আম্রপল্লব পঞ্চরূপে বসে আছে। পিঁড়িতে মাটির ঠাঁয় সলাজ চাহনিতে বসে আছে কনে। সামনে কুলায় রাখা গামছা, কাপড়, সিঁদুর, সাবান, কাঁচা হলুদ, গিলা, ধান, দুর্বা, ফুল, বেলপাতা, প্রদীপ ও নানা আশীর্বাদ উপকরণ। কোনোরকম সাজসজ্জা ছাড়াই একদল বউ-ঝিঁয়েরা কলহাস্যে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন যারা রান্নাঘরে হলুদ, মরিচ, ধনে বাটায় ব্যস্ত, তাদের জলদি আসার হাঁকডাক শোনা গেল। এরপর, আটপৌড়ে শাড়িতে ঘোমটাটানা এক বউ দরদি কণ্ঠে সুর ধরল।

‘জলের ঘাটে দেইখা আইলাম,
কি সুন্দর শ্যাম রাই,
শ্যাম রাই, ভোমরাই, ঘুইরা ঘুইরা মধু খায়।...
ভাইবে রাধারমণ বলে
পাইলাম নারে হায় রে হায়।
পাইতাম যদি প্রাণবন্ধুরে
রাখতাম রে পিঞ্জিরায়।’

টিমালয়ে গানটির সাথে চলল করতালি ও পদচালি। নানা বয়সীদের সম্মিলনে দর্শনীয়ও বটে। একক কণ্ঠে এক দুই চরণ পর সঙ্গতরা দোহারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। গীত ও নৃত্যযোগে নারীরা বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল। পরম্পরা লয়ে সুর, তাল ও ছন্দে সমবেত দলটির শরীর মাটির দিকে ঝুঁকে আবার সোজা হয়ে ঘোরে। ছন্দোবদ্ধ পায়ের তাল ও করতালিতে বিমোহিত হতেই হবে। বিশেষত, তালের একক মাত্রায়ই তালির যে বৈচিত্র্যময়তা তা হৃদয় ও নয়ন ভোলানো। হাওড় জনপদে এ করতালিকে থাপা বলে। ধামাইল গানটি টিমে তালে শুরু হয়ে যখন দ্রুত লয়ে পৌঁছে তখন পদচালি, করতালি ও মাত্রা লয় বাড়ে। এক ঘোর লাগা নৃত্যগীত। পল্লিবালাগণ গানের সাথে নাচ ও তালির মিলনে একের পর এক ধামাইল গেয়েই চলেছে–

'আমি হী হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া
নাগরী গো
কী হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া
আমার জল ভরা না হইলো
কুলে কালী রইলো
কাঙ্খের কলসী যায় ভাসিয়া।'

কে বলবে, এই নারীদের প্রথাগত কোনো তালিম নেই। তাল, লয়, ছন্দের ব্যাকরণ না জানা থাকলেও শিল্পের ভূগোল তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে। বারান্দায় বসে একদল প্রবীণ রমণী মাথা নাড়ছে। এককালে আসর তাঁদের দখলে ছিল সেই ভঙ্গিমায়। একজন মাঝেসাঝে মন্দিরায় টুংটাং করছে। ওদিকে বিশ-একুশ বছরের একজন মেয়ে খোল বাজাচ্ছে।

যুগে যুগেই গ্রামীণ সংস্কৃতি উৎসারিত হয়েছে লোকজ গীত-নৃত্য-নাট্য-সাহিত্যের মধ্যদিয়ে। ধামাইল গান তেমনই এক অনুষঙ্গ। পল্লিনারীর যাপনের সকল বৃত্তান্তই রয়েছে ধামাইল গানে। প্রেম-বিরহ, মান-অভিমান, অভাব-অভিযোগ, ঘরকন্যা ও সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়বস্তুর আখ্যান। বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের নানা পর্ব পর্যায়ক্রমে পরিবেশিত হয় এই গানে। কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গলীলার লৌকিক রূপ যার অন্যতম বিষয়। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে বিরহ বিচ্ছেদ বৈরাগ্য থাকলে এই নৃত্যগীত জাগতিক উল্লাসে ভরপুর। ফলে বিচ্ছেদ ও প্রকাশিত হয় আনন্দরসে। যা ছয়মাস জলে ডুবে থাকা হাওড় জনপদের নারীদের বিনোদনে সহোদরাস্বরূপ।

ধামাইল শব্দটির উৎস নিয়ে নানামত রয়েছে। কথিত রয়েছে, ধামা থেকে ধামাইল শব্দের উৎপত্তি। বাংলা উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, এর আঞ্চলিক অর্থ উঠান। বাড়ির উঠানে হওয়ায় এই গানের নাম হয়েছে ধামাইল। কেউ কেউ বলে এর অর্থ ভাব। রাধারমণ ভাবুক প্রকৃতির হওয়ায় এই ধরনের নাম হয়েছে। আবার পিরের দরগায় নৃত্যগীতকে ধামালী বলা হয়। চৌদ্দ শতকেও এই নামটির ব্যবহার লক্ষণীয়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে ধামালী শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন–

'ধামালী বুলিতে কাহ্নে দিহলি আস
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।' (দানখণ্ড)

সেইসাথে মধ্যযুগের লোককাব্যেও ধামালী সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। এই নৃত্যগীত বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার জেলা অঞ্চলের লোকসংগীত হিসেবে পরিচিত। পার্শ্ববর্তী বাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, নেত্রকোনার খালিয়াজুড়ি, মদন, ধর্মপাশা, কলমাকান্দা ও ময়মনসিংহের কিছু স্থানে শোনা যায়। মূলত ভাটি অঞ্চলই ধামাইল গানের আশ্রম। সেখান থেকেই ধামাইল ভারতের করিমগঞ্জ, আসাম, শিলচর, ত্রিপুরা, কাছাড়, হাইলাকান্দিসহ নানা স্থানে ছড়িয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

গণসঙ্গীত কিংবদন্তি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লোকসঙ্গীত সমীক্ষায় ধামাইল প্রসঙ্গে রয়েছে, 'লৌকিক নৃত্যে বাংলাদেশের অত্যন্ত দীন, যা-ও বা ছিল তাও লুপ্তপ্রায় বা বিকৃত। কিন্তু শ্রীহট্টের মেয়েরা এক প্রাণবন্ত নৃত্যধারাকে প্রবাহিত রেখেছেন তাদের ধামাইল নৃত্যে। সেই ধামাইল নৃত্যের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ধামাইল গান। শ্রীহট্ট জেলার এ একান্তই নিজস্ব জিনিস।... এর বহু রূপ আছে। কিন্তু সুরের দিক থেকে তা মূলত ভাটিয়ালির ঠাটের ভিতরেই। তবে, ভাটিয়ালির টান বা মীড়ের আন্দোলন না থাকাতে প্রকাশভঙ্গি গেছে সম্পূর্ণ পালটে।' বলা যায় সুবিশাল হাওড়াঞ্চল ধামাইল গানের সঙ্গে যে নৃত্যের মিশ্রণ ঘটিয়েছে তা লোকশিল্পে এক ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে যা পল্লির মানুষের প্রাণকে মোহিত করে।

একসময় ধামাইল ছিল সর্বজনীন। কালপ্রবাহে ধর্মীয় ভেদাভেদ ধামাইল গানের সর্বজনীনতায় সীমানা টেনেছে। তাই হিন্দুধর্মালম্বীদের বিয়ে, মঙ্গলাচরণ, গায়ে হলুদ, কনে বিদায়, জলভরা, দ্বিরাগমন, অন্নপ্রাশন, পূজা, জামাইবরণ, উৎসবসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক আয়োজনে ধামাইল গান হয়ে থাকে। ধামাইল গানের বিভিন্ন পর্ব আছে। বন্দনা, আসর, বাঁশি, জলভরা, গৌররূপ, বিচ্ছেদ, শ্যামরূপ, কোকিল, সংবাদ, কুঞ্জ, সাজানি, স্বপন, চন্দ্রার কুঞ্জ, মানভঞ্জন, মিলন, সাক্ষাৎ, খেদ, বিদায় বা আউট গান।

সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের ছোট্ট এই গ্রামটির নাম পৈণ্ডুপ। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে জাদুকাটা নদী। বিবাহ অনুষ্ঠানে রীতি অনুসারে মঙ্গলাচারে ধামাইল অপরিহার্য। এর অনুপস্থিতিকে অশুভ, অমঙ্গল বলেই মনে করে ও মানে। উৎসবের প্রয়োজনে কখনো উষাকালে, কখনো ভরদুপুর, বিকেল, সন্ধ্যারাত্রি, কখনো-বা মধ্যরাত্রিতে ধামাইলের সুর ও থাপা আঁটি বা গাঁয়ের নীরবতা ভেঙে রোমাঞ্চিত করে পল্লিবাসীদের। উল্লাসরত সমবেত গীত, নৃত্যের ঠেকা, থাপার মনোমুগ্ধকর সুরে আজ ম ম করছে চারদিক। থাপা দিয়ে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে নেচে নেচে গাইছে, '...আমি একটা পিরিত করলাম ভাঙ্গা ঘরে বইয়া, ঘরে আছে কুইটনা বুড়ি, ওইটাই দিছে কইয়া, সখি কেমনে পিরিত রাখি গো সখি, কেমনে পিরিত রাখি, বাঘে খাওরা ননদীরে ডরাই ডরাই থাকি।' বিরহের এ আহাজারি সন্ধ্যারাতের নিস্তব্ধতা ফুঁড়ে বুকের গহিনে যেন ঘাপটি দিয়ে বসেছে। গানের কথার সাথে খুঁড়ে চলেছে জীবনের আখ্যান। সুদূর অতীত ডুবে হয়তো তড়পাচ্ছে অতীতের নবরসে। পা ঠুকে ঠুকে, থাপা দিয়ে গাইতে থাকা নারীরা নিজেরাও জানে না মানসপটে কিসব চিহ্ন তারা রেখে চলেছে।

জনশ্রুতি রয়েছে, রাধারমণ দত্ত পুরকায়স্তের পরবর্তী সময়ে ধামাইল গানে অনুপ্রাণিত হয় প্রতাপরঞ্জন তালুকদার। তাঁরা ছাড়াও ধামাইল গানের গীতিকার ছিলেন মধুসূদন দাস, যতীন্দ্রমোহন রায় তালুকদার, সূর্যকান্ত বিশ্বাস, রুক্মিনী, চিত্রাঙ্গন মাস্টার, ভরত চন্দ্র সরকার, জীতেন্দ্র, নবকুমার, সন্ধ্যা রানী চন্দ, শিখা রানী দাস, রামজয় সরকার, শ্যামসুন্দর, মহেন্দ্র গোঁসাই, দুর্গাপ্রসাদ, মুকুল ঠাকুর প্রমুখ। এছাড়াও অগনিত ধামাইল গীতিকবি রয়েছে। জিজ্ঞাসা রাখা যায়, ইতিহাসে তাঁদের নাম রয়েছে কিন্তু যুগের পর যুগ যাঁরা লোকজ সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখল তাঁদের স্থান কোথায়?

বাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে ধামাইল। সৃষ্টিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায়। প্রবহমানতায় প্রাণ বেঁচে থাকে। ধামাইল গান প্রবাহে মাতৃস্বরূপা হলেন জনপদের নারীরা। ধামাইল নৃত্যগীত জুড়ে বিরাজ করে তাঁদের শৈলী। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ব্যথা, হতাশা-নৈরাশ্য, ভালোবাসা-বিচ্ছেদ-বিরহ, প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি সুনিপুণ কলায় তাঁরা উপস্থাপন করে। সে এক কাল ছিল নারীর অন্দরমহল থেকে বাড়ির সামনের আঙ্গিনায় যাওয়ার অনুমতি পেতে লেগে যেত বিশ বাইশ বছর। হেমন্তের মিঠে বিকালে যখন আঁটির পুরুষেরা খেতখামারে। তখন কাজ সেরে বাড়ির পেছনের উঠানে সকল বউঝিঁও জমায়েত হতো। সেই জমায়েতে কাঁথার ফোঁড় তুলতে তুলতে, চলে বিলি কাটতে কাটতে কখনো ধামাইল গান, কখনো ধামাইল গীতনৃত্যে মেতে উঠত। হাজারো বঞ্চনা, একাকিত্ব, আনন্দে ধামাইল গানই ছিল ভরসা। হৃদয়ে জমে থাকা প্রণয়-বিরহ-বিচ্ছেদ প্রকাশিত হতো রাধা কৃষ্ণকে উপজীব্য করে।

এ যেন বলতে মানা অনুভূতি ছল করে বলে হৃদয়ের ভার লাঘব করার এক মাধ্যম। নারীর ঘরানা বাহিরানার প্রকৃতিতে বদল আসলে লক্ষণরেখার প্রথা বিলীন হয়নি। ফলে, শিল্পীসত্ত্বা এতকালেও মহাবিশ্বের আলো দেখতে পেল না। উঠানজুড়ে যুগের পর যুগ কোনোরকম স্বীকৃতি, প্রাপ্তি ছাড়া প্রকাশ করে গেল! অথচ ঐতিহ্যপূর্ণ এই সংস্কৃতির ধারা টিকিয়ে রেখেছে বিশাল হাওড় জনপদের নারীগণ।

পুরুষ আধিপত্যবাদী সমাজব্যবস্থায় নারী শিল্প সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উত্থানে হয়তো মহাজন হওয়ার সুযোগ পায়নি। যদিও বাঙলার বাউল, বৈষ্ণব নারীর হাতে শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু গৃহী নারী চারপাশের লক্ষণরেখা ডিঙিয়ে রচিত কর্তী হয়ে উঠতে পারেনি। যারা অল্পবিস্তর সৃষ্টি করেছে তারা চৌকাঠ পেরোতে পেরেছে হাতেগোনা। কিন্তু সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের উত্থানে নারীরা সঞ্জীবিত। প্রথাগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার ইতিহাসে নারীকে অতিরিক্ত হিসেবে নয় মূল কৃতিত্ব দেওয়াই ন্যায্য। নারী বা পুরুষ বা যেকোনো বৈচিত্র্যপূর্ণ লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতির কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ যা রয়েছে তা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার। আর এই মানসিকতা জিইয়ে রেখে সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ধামাইল গান ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কারণে লুপ্ত হওয়ার পথে। তাই সংরক্ষকদের স্বীকৃতির বিষয়টি এড়িয়ে গেলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সংশয়ের অবকাশ নেই, লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে ধামাইল অমূল্য ধন। এই অমূল্যধনকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শুধু বয়ানে ও নথিতে নকশা করলে হবে না। ভাবতে হবে, যারা বাংলার ঐতিহ্য সংস্কৃতি হৃদয় দিয়ে আগলে রেখেছে তাঁদের কিভাবে আরো যত্ন করা যায়, তাদের কিভাবে লোকায়ত সংগ্রাহক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। তাদের এই শিল্পকে কিভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আয়ের উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ভুললে চলবে না, বিশাল হাওড়াঞ্চলের নারীরা ধামাইল গান ধরে না রাখলে মহাজনদের সৃষ্টিও হারিয়ে যাবে। আগামী প্রজন্মকে নিজের প্রয়োজনের শেকড়ে ফিরতেই হবে। সভ্যতার প্রয়োজনেই ফিরতে হবে। তাই, শিকড়ের সঞ্জীবনীকে লুপ্ত হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানো ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই।

জয়শ্রী সরকার ॥ গবেষক ও কথাসাহিত্যিক

মন্দির প্রাঙ্গণ

ভ্রমণ

বশিষ্ঠ মুনি আশ্রমে একদিন

সুমন্ত গুপ্ত

তামাবিল সীমান্ত পার হয়ে ভারতের ডাউকিতে যখন পা রাখলাম আমি আর মা, ঘড়িতে বাংলাদেশ সময় তখন দুপুর বারোটা বাজে। আগের থেকে পরিচিত ড্রাইভার বাপ্পিকে বলা ছিল তাই ঠিক সময়েই উপস্থিত ছিল বাপ্পি। কাস্টমসের কাজ শেষ করতে করতে ১টা বাজি বাজি আজ অনেক মানুষ যাচ্ছে ভ্রমণে। তাই এত সময় লাগল। 'শিলং শহরে পৌঁছতে প্রায় আরো দুই আড়াই ঘণ্টা তো লেগেই যাবে' বাপ্পিদা বলল দুপুরে খাবার কি খেয়ে যাবে। আমি বললাম, 'বাপ্পি, তোমার প্রস্তাবটা মন্দ না। আমি রাজি হয়ে গেলাম। পেটপূজা শেষ করে বাপ্পির গাড়িতে করে ডাউকি বাজার থেকে ৮২ কিলোমিটার দূরের শিলং-এর পথে যখন রওনা হলাম, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখন। শুরুতে প্রায় ঘণ্টা খানেক রাস্তা বেশ কিছুটা খারাপ। বাপ্পি জানালো, শিলং থেকে ডাউকি বর্ডার পর্যন্ত চার লেনের রাস্তার কাজ চলছে। দক্ষ হাতে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে নিচ্ছে বাপ্পি।

বশিষ্ঠ মুনির ভাস্কর্য

প্রবাহিত জলধারা

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠান্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগল। দেখলাম, মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমরা। বৃষ্টির ধারা বেড়ে গেল। একরাশ মেঘ এসে পুরো ঢেকে দিয়েছে আমাদের। এক হাত দূরের জিনিসও তখন দেখা যাচ্ছে না। এভাবে বেশ খানিকটা পথ চলার পর মেঘ কেটে গেল, বৃষ্টিও থেমে গেল। পথের দুধারের পাহাড়ি উপত্যকা আর ঝর্নার অবর্ণনীয় সৌন্দর্য দুচোখ ভরে দেখতে লাগলাম। পাহাড়ি কন্যার রূপ দেখতে দেখতে চলে এলাম শিলং শহরে। ঘড়ির কাঁটায় তখন ৫টা। পুলিশ বাজারে পৌঁছে উঠে পড়লাম হোটেলে। সেদিনের মতো বাপ্পিকে ছেড়ে দিলাম। কারণ, কাল সকালবেলায় বের হয়ে পড়ব গৌহাটির পথে। শিলং শহরে রাত ৮টা হতেই সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। তাই রাতে হোটেলেই খাওয়া দাওয়ার কাজ শেষ করে নিদ্রা দেবীর আবেশে চলে গেলাম। সকাল সাড়ে ৭টা হবে বাপ্পির ফোন, ঘুম ভাঙ্গল নাকি আমাদের। সকাল সকাল বের হতে হবে কারণ শিলং শহর থেকে গৌহাটি যেতে তিন ঘণ্টা লেগে যায়। যাই হোক দ্রুত তৈরি হয়ে নিলাম, পথে সকালের প্রাতরাশ সেরে নেব। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম আমরা। পথিমধ্যে আমরা প্রাতরাশ সেরে নিলাম। শিলং থেকে গৌহাটির এ প্রচণ্ড ব্যস্ত রাস্তাতেও দেখলাম চার লেনের কাজ চলছে। আস্তে আস্তে শিলংয়ের ঠান্ডা থেকে আসামের গরমের মাঝে ঢুকলাম। নগর জীবনের ব্যস্ততার ছায়া দেখলাম পথে প্রান্তরে। শিলং শহরে তেমনটা চোখে পড়েনি। বন্ধুরা এত সময় ধরে শুধু বকবক করেই যাচ্ছি। এখনো বলাই হলো না আমরা সাতসকালে কোন গন্তব্যে ভ্রমণের পানে বের হয়েছি। আমরা যাচ্ছি গৌহাটি শহরে বশিষ্ঠ মুনি আশ্রমে। বশিষ্ঠ আশ্রম গৌহাটি শহরের ১২ কি. মি. দক্ষিণে সন্ধ্যাচল পাহাড়ে ছবির মতো আধুনিক স্থাপত্য সম্বলিত একটি প্রাচীন আশ্রম। লোকে বলে, এখানেই মহর্ষি বশিষ্ঠ নামের বিখ্যাত মুনি বাস করতেন। এখানে মুনির পায়ের ছাপ রয়েছে এবং মূর্তিও তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যা, ললিতা আর কান্তা নামের তিনটি পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে আশ্রমের সবুজ ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে। এরা আশ্রমের কাছেই মিলেছে। মিলিত ধারাই হলো বশিষ্ঠ গঙ্গা। আশ্রম শিবমন্দির, আর পথেই পড়ে গুরুদ্বার ও রাধাকৃষ্ণ মন্দির। সকল ধর্মের মানুষের তীর্থস্থান এই বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম। গুয়াহাটির কিংবদন্তি এবং ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরোনো। যদিও নগরীটির উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি, তবে মহাকাব্য, পুরাণ এবং অন্যান্য পরম্পরাগত ইতিহাসে উল্লেখ করা কাহিনিসমূহের থেকে এটাকে এশিয়ার একটি অন্যতম পুরোনো নগর হিসেবে অনুমান করা হয়। ইতিহাসের মতে গুয়াহাটিতে কয়েকটি প্রাচীন রাজ্যের রাজধানী ছিল। মহাভারতের মতে এটি নরকাসুর এবং ভগদত্ত রাজ্যের রাজধানী ছিল। অতীতে এই শহরের নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। সর্বধর্মের শৈব, বৈষ্ণব। তন্ত্র, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের সমন্বয় ঘটেছে এই সাংস্কৃতিক শহরে। শহরের প্রাণকেন্দ্র নেহেরু পার্ককে কেন্দ্র করে শহরের বিস্তার। দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম পল্টন বাজারে। বাপ্পি বলল পল্টন বাজার থেকে বশিষ্ঠ মন্দির পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে। পল্টন বাজার থেকে লোকাল বাস সরাসরি বশিষ্ঠ আশ্রম পর্যন্ত যাওয়া আসা করে। রাস্তায় যেতে যেতে দুপাশের মনোরম পরিবেশ দেখতে দেখতে কখন যে বশিষ্ঠ আশ্রম পর্যন্ত চলে এসেছি বুঝতেই পারিনি। গাড়ি থেকে নেমেই আমরা নগ্নপায়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আশ্রমে ঢুকতেই প্রথমে আমাদের অভিনন্দন জানালো বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে থাকা একঝাঁক বানরের দল, কিছু সময় পরপর সারা আশ্রমজুড়ে দৌড়ঝাঁপ করে বেড়ায় এই আশ্রমে থাকা বানরগুলো। আমরা এগিয়ে গেলাম মন্দিরের দিকে, আমাদের মতো শত শত মানুষ সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলছে মন্দির পানে। মন্দিরে ঢুকেই শেষ প্রান্তে এর নিচের দিকে নামার সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখা পেলাম বশিষ্ঠ মুনির ধ্যানকক্ষ। যে ঘরটিতে বশিষ্ঠ মুনি ধ্যান করতেন ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। একজন পুরোহিত ব্রাহ্মণ ওখানে পুজো দিচ্ছেন। এখানে পূজা দিয়ে এগিয়ে গেলাম আশ্রমের ঠিক পেছনের দিকে। শো শো শব্দ করে পাহাড়ি নদীর জলধারা বয়ে চলছে। অসাধারণ তার রূপ। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। বাপ্পি বলল যত দর্শনার্থী বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে ঘুরতে আসেন তারা সবাই এই পাহাড়ি নদীর জলে স্নান করেন। বলা হয়ে থাকে এই জল স্পর্শ করলে এবং মাথায় ছোঁয়ালে মনের কালিমা দূর হয়। তাছাড়া জলধারার মাঝখানে যে পাথরগুলো আছে ওখানে বসে সুন্দর সময় অতিবাহিত করা যায় এবং ঝরনার বয়ে যাওয়া জলের স্রোত জলের শব্দ অবশ্যই আপনার মনকে আনন্দিত করবে বা মনকে হালকা করবে এটা নিশ্চিত। বশিষ্ঠ আশ্রমের চারপাশে ঘন জঙ্গল আর আশ্রমের নিচের দিকে বাস ও অটোর স্ট্যান্ড। একপ্রান্তে ফুল-বেলপাতা এবং পুজোর যে সামগ্রী হয় ওসবের দোকান সাজিয়ে বসে আছে দোকানিরা। আপনি চাইলে ওখান থেকে ফুল-বেলপাতা বা আপনার পুজোর যে সামগ্রী দরকার হয় ওগুলো নিয়ে পুজো দিতে পারেন।

পথের ঠিকানা

ঢাকা থেকে গৌহাটি বিভিন্ন ভাবে যেতে পারবেন। ঢাকা থেকে কোলকাতা সেখান থেকে ট্রেন অথবা প্লেনে করে যেতে পারবেন গৌহাটিতে। তবে সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে সিলেটের পর তামাবিল বর্ডার হয়ে শিলং থেকে গৌহাটি। গৌহাটি শহরে পল্টন বাজারে বাস, ট্যাক্সি পাওয়া যাবে বশিষ্ঠ মুনি আশ্রমে যাওয়ার জন্য। তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ডাউকি বর্ডার উল্লেখ করে দিতে হবে।

সুমন্ত গুপ্ত ॥ পরিব্রাজক, ব্যাংকার

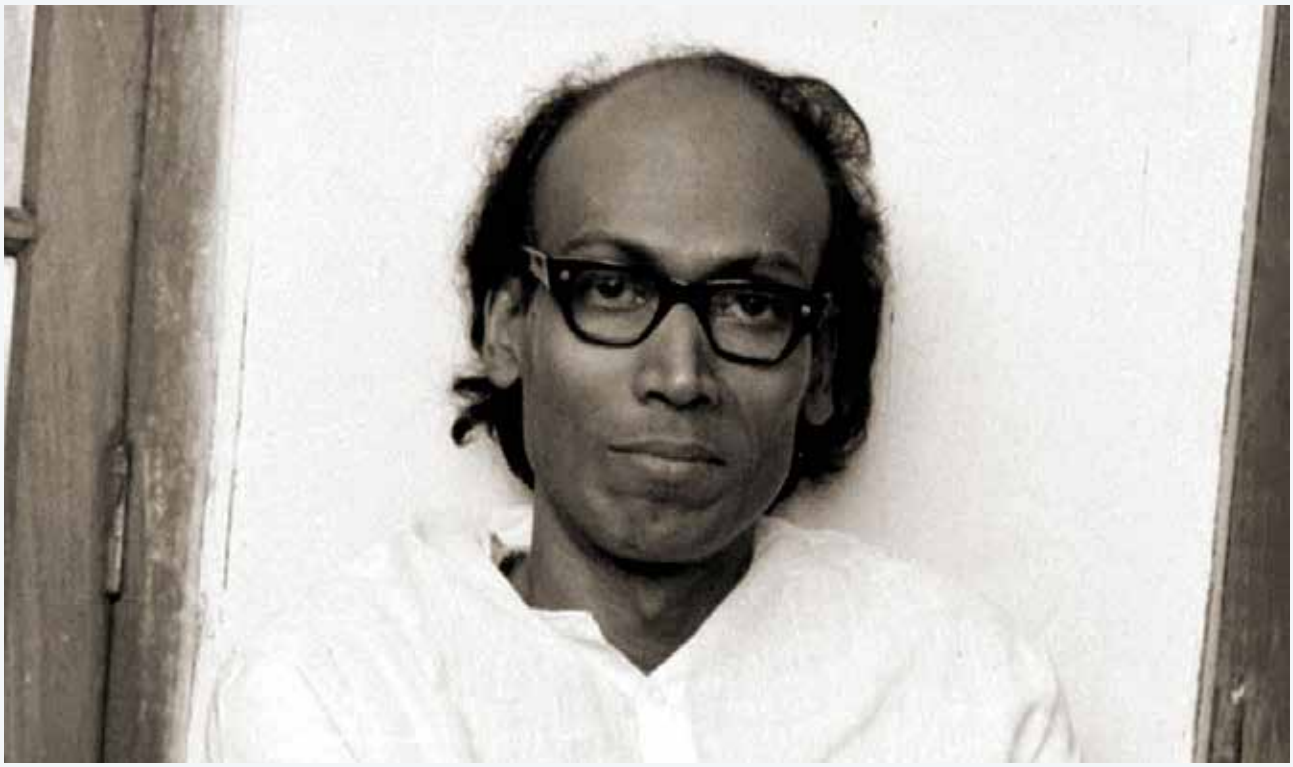

শঙ্খ ঘোষ

স্মরণ

শঙ্খ ঘোষের নাট্যচেতনা

অবন্তিকা পাল

"মাসদেড়েক আগে, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের প্রযোজনায়, একটি অভিনয় চলছিল কার্জন পার্কে। পড়তি বিকেলে, খোলা জায়গায়, ছোটো একটি বৃত্ত তৈরি করে নিয়ে সেখানে রক্তকরবীর অভিনয় করছিলেন কয়েকজন মানুষ, যাঁদের কেউ চোখে দেখতে পান না। দর্শক ছিলেন অল্প কয়েকজন। পূর্ণ অন্ধদের সেই সুঠাম অভিনয় শেষে দর্শকেরা যখন উচ্ছ্বাস জানাচ্ছেন, আশ্চর্য একটি দৃশ্যের জন্ম হলো তখন। সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে কুশীলবেরা সবাই তাঁদের খোলা দুহাত বাড়িয়ে রাখেন প্রার্থীর মতো। কী চান তাঁরা? কিছু কি চান? তাঁদের মধ্যে একজন বললেন : 'আপনারা সবাই এসেছেন, কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি না। আপনারা যদি আমাদের সকলের হাতের ওপর একটু হাত ছুঁয়ে যান, আপনাদের ভালো-লাগাটা আমাদের মধ্যে পৌঁছবে, আমাদের ভালো লাগবে।'

দর্শকেরা একে একে সকলের হাতে হাত রাখলেন, কারো কারো চোখে এল জল। আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়..."

কলকাতা শহরের একটি নাট্যদলের অভিনয় দেখে বিমুগ্ধ শঙ্খ ঘোষ এই বক্তব্য রাখেন ২০০৭-এর ৩ এপ্রিল, প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতায়, যা পরবর্তীকালে আমরা লিখিত আকারে পাই তাঁর 'অন্ধের স্পর্শের মতো' গদ্যগ্রন্থে। শঙ্খ ঘোষ এ লেখায় ভাষা, যা সংযোগের মাধ্যম, তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। এবং তাঁর লেখা অধিকাংশ গদ্যের মতোই, এখানেও তিনি নিপুণভাবে স্পর্শ করে গেছেন নাটকের অনুষঙ্গকে। 'রক্তকরবী'–যে রবীন্দ্রনাটক প্রসঙ্গ তিনি একাধিক গদ্যরচনায় তো বটেই, এমনকি সাক্ষাৎকারধর্মী গ্রন্থেও ('এক বক্তার বৈঠক') উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের চেতনার নৈকট্য আজীবনের। তাঁর লেখা 'নির্মাণ ও সৃষ্টি' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের লেখাকে অনুধাবনের প্রক্রিয়ায় এক অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। 'এ আমির আবরণ', 'উর্বশীর হাসি', 'কবির অভিপ্রায়' প্রভৃতিও এই মর্মে উল্লেখযোগ্য। কবি শঙ্খ ঘোষের ওই একই নৈকট্য দেখতে পাই নাটক তথা থিয়েটারের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' গ্রন্থটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের আলোচনায় শঙ্খ লিখছেন :

'কবিতা কেমনভাবে আত্মস্থ হয়ে আসছে অন্য শিল্পরূপের মধ্যে, স্পেনীয় কবি উনামুনো–কে কেন বলতে হয় 'উপন্যাস, তার মানেই কবিতা', নাটকের মধ্যে কতটা আমরা খুঁজতে পারি পরিমিত বাস্তবের পরিবর্তে গূঢ়তর জাতীয় সত্তা–তার প্রতি অল্পই আমরা অবহিত ছিলাম। আমাদের মঞ্চকে ভাবালু তুচ্ছতা থেকে বাঁচাবার জন্য কোন্ সমান্তরাল

আদর্শ রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দুর্ভাগ্যবশে তা আমাদের লক্ষ্যে আসেনি বহুকাল।

সে-হিসেবে বহুরূপীর 'রক্তকরবী' অভিনয় এক ঐতিহাসিক মর্যাদাময় ঘটনা। এই অভিনয়ের মধ্যে একদিকে যেমন উঠে এল এর নাটকীয়তার সামর্থ্য, এর সতেজ মঞ্চযোগ্যতা, তেমনি এঁরা ধরিয়ে দিলেন যে কবিতা আর জীবন পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।'

শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন ধারাগুলিও পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়। তাই যে শঙ্খকে আমরা মূলত কবি হিসেবে চিনতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেছি, ভুললে চলবে না তিনি একজন গদ্যকার ও নাট্যকারও। প্রসঙ্গত মনে পড়ে তাঁর লেখা 'সুপুরিবনের সারি' উপন্যাসের কিশোর নীলুকে, যে মামাবাড়ির চিলেকোঠায় উপুড় হয়ে শুয়ে নাটক পড়ত। ভাবত, সিরাজউদ্দৌলা নাটকটা রেকর্ডে যা শুনেছে তার থেকে গ্রন্থে কতখানি আলাদা। এইসব দৃশ্যকল্প (নাকি দৃশ্যসত্য) নাটকের সঙ্গে শঙ্খ ঘোষের আবাল্য নৈকট্যকে সুস্পষ্ট করে। শঙ্খ ঘোষের পিতা মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন স্কুলের প্রধানশিক্ষক। ছাত্রদের তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলেন–'এ নেশন ইজ নোন বাই ইটস স্টেজ।' স্বভাবতই তাঁর সুযোগ্য পুত্রদের নাট্যানুরাগের উৎস সন্ধানে এই বাক্যটি শাশ্বত হয়ে ধরা দেয়। মণীন্দ্রকুমারের বড় ছেলে সত্যপ্রিয়, অর্থাৎ শঙ্খ বা চিত্তপ্রিয়ের বড়দা, কলেজজীবনে পাঠ্য ম্যাকবেথ শুধু অনুবাদই করেননি, ভাইবোনদের দিয়ে অভিনয়ও করিয়েছিলেন কয়েকটি দৃশ্য। আর তেইশ বছরের শঙ্খ 'রক্তকরবী' দেখে বহুরূপীর দফতরে যে চিঠি লিখেছিলেন, সে লেখাকেই নাট্যপ্রসঙ্গে কবির প্রথম গদ্য বলা যায়।

'রক্তকরবী : ক্রিসেন্থিমান' প্রবন্ধে বহুরূপী নির্দেশিত রক্তকরবীর দর্শন-অভিজ্ঞতা তো বটেই, এমনকি ১৯২৪-এ লিখিত এই রবীন্দ্রনাটক কীভাবে শম্ভু মিত্রের মঞ্চায়নের হাত ধরে আধুনিক বাংলার নাট্যচর্চায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠল, শঙ্খ ঘোষের লেখা থেকে সে কথাও জানতে পারি আমরা। ১৯০১ সালে সুইডিশ নাটককার, কবি ও ঔপন্যাসিক অগস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ লেখেন 'আ ড্রিম প্লে' নাটক, যেখানে আত্মকারায় বন্দি এক অফিসারকে মুক্ত করার জন্য স্বর্গ থেকে নেমে আসেন ইন্দ্রকন্যা অ্যাগ্নেস। স্ট্রিন্ডবার্গের নাটক প্রসঙ্গে শঙ্খ লিখছেন :

'এ নাটকও দেখাতে চায় জড় বস্তুপিণ্ড থেকে চেতনার মুক্তি, অহংময়তা থেকে নির্গলিত হবার পথ। সেখানেও শুনতে পাই : কেন আবর্জনা থেকে বেরিয়ে আসে ফুল, আলোর দিকে ফুটে উঠে ঝরে যায়, এই তাদের আনন্দ।'

'আ ড্রিম প্লে' নাটকের শেষে, যখন জ্বলে যাচ্ছে একটু একটু করে সমস্ত দুর্গ, তার মধ্যে দেখা দিচ্ছে হতাশ শোকময় প্রশ্নাতুর মুখের ভিড়, তখন একটি ফুলের কুঁড়ি, তার আকস্মিক প্রস্ফুটনে হয়ে ওঠে এক আগুনরঙা ক্রিসেন্থিমাম ফুলের গুচ্ছ।

শঙ্খের এই গদ্য আমাদের ভাবায়, তেইশ বছর পরে লেখা 'রক্তকরবী' কেন 'আ ড্রিম প্লে-র থেকে অন্তরঙ্গেও পৃথক। স্ট্রিন্ডবার্গের নাটকে ক্রিসেন্থিমামের জ্বলে ওঠা একটি ক্যাথারসিসের মতো। প্রকট–যা দর্শককে জয়ের আনন্দে উন্নীত করতে সক্ষম। রবীন্দ্রনাথের নাটকে রক্তকরবী ফুলটি শেষাংশে কোনো ক্যাথারসিস নিয়ে আসে না, ফুলটি থাকে, বিশু তাকে তুলে এনে বারবার নন্দিনীর কাছে রাখে। গোটা নাটকজুড়েই ফুলটি থাকে। আন্ডারটোন হয়ে বাজতে থাকে। রক্তকরবীর শেষেও তাই বিশু পাগলের কণ্ঠে আহ্বানের ডাক–'এবার আমার সময় হল একলা মহাযাত্রার। হয়তো গান শুনতে চাইবে। আমার পাগলী! আয় রে ভাই এবার লড়াইয়ে চল্।' ক্রিসেন্থিমাম এক বিজয় ঘোষণা। অন্যত্র রক্তকরবী এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, যা চলতে থাকবে, হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে যাবে না। কেননা পাকা ফসলের ডালা ভরে ওঠার প্রক্রিয়ায় বিশু ও ফাগুলালদের ছুটে চলতে হবে নিরন্তর। স্ট্রিন্ডবার্গ তাঁর অফিসারের বন্দিদশা ঘোচাতে নামিয়ে এনেছেন স্বর্গের রমণীকে। অথচ রবি ঠাকুর বারবার বলছেন, 'রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি।' আর কে না জানে, রক্তমাংসের নন্দিনীদের লড়াই কোনও ইউটোপিয়া হতে পারে না। রবীন্দ্রনাট্যতত্ত্বের এ জাতীয় ব্যাখ্যায় স্বভাবতই যখন ব্রেখট-এর কথা স্মরণে আসে তখন 'নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'-র আলোচনায় শঙ্খ লেখেন–'ন্যাচারালিজমের দৌরাত্ম্য থেকে সরিয়ে নেবার ইচ্ছেয় এঁরা দুজন সদৃশ, কিন্তু সরিয়ে নেবার জন্য ব্রেখট যেমন এমপ্যাথি-বিমুখ হতে পারতেন, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেটা সম্ভবপর ছিল না।'

ব্রেখটীয় অ্যালিয়েনেশনের দৃষ্টান্ত বোধ করি শঙ্খ ঘোষ অনূদিত 'মানুষ' নাটকটিতে দেখা যায়। হ্বালটার হাসেনক্লেভার-এর 'ডি মেনশেন' (দ্য পিপল) নাটকটির বাংলায় রূপান্তর করেন শঙ্খ ঘোষ। হ্বালটার ছিলেন জার্মান কবি ও নাটককার। ১৯১৪ সালে তাঁর লেখা বৈপ্লবিক নাটক 'দ্য সন' প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে, সমালোচিতও হয়। হ্বালটার 'দ্য পিপল' লেখেন ১৯১৮ সালে। ১৯৩৩-এ নাৎসিরা ক্ষমতায় এলে তাঁর অধিকাংশ কাজ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গ্রেফতার করা হয় দুবার। ১৯৪০-এ রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে ক্যাম্পে থাকাকালীন নিজেকে হত্যা করেন তিনি। ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাননি কখনো। 'মানুষ' নাটকের পরতে পরতে ক্ষমতার প্রতি, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি সেই বীতশ্রদ্ধা ও প্রত্যাখ্যান চোখে পড়ে। এ লেখার প্রতিটি চরিত্রই প্রতীকী, বাস্তবতা থেকে আপাতদূরবর্তী তাদের সংলাপ। আদ্যন্ত অভিব্যক্তিতত্ত্বের প্রতিফলন।

আলেকজান্ডার।। ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে তোমার?
বুড়ো বেয়ারা।। আমরা মানুষের জাত
ভিখিরিটি বাজনা বাজায়।
কালা আর বোবা এগোয় মধ্যের টেবিলের দিকে।
বুড়ো বেয়ারা তাদের কাছে যায়। অঙ্গভঙ্গি করে কালা আর বোবা।
ডাক্তার।। (সবিস্ময়ে) বোবা-কালা!
মাথা নাড়ায় বুড়ো বেয়ারা, ঢুকে যায় বাড়ির মধ্যে।
আগাথে।। (খালি পা, চোদ্দবছর, একটা বাক্স নিয়ে এগোয়) দেশলাই?
সাকরেদ তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।
ডাক্তার হাসে।
বোবা-কালা তাকে টাকা দেয়।
আলেকজান্ডার তাকে টেনে নেয় হাতের কাছে।
লিসি।। (ব্যালকনিতে এসে বোবা-কালার দিকে হাত নাড়িয়ে) টাকা হচ্ছে টাকা!
চলে যায়।
সাকরেদ।। ধারের ওপর বেঁচে আছি
আলেক।। নাম কী তোমার?
আগাথে।। আগাথে।
সাকরেদ।। শিশুশ্রমিক!
আগাথে।। খেতে পাই না আমরা
সাকরেদ।। শেয়ার
ডাক্তার।। (তাঁর শেয়ার বার করে) এটা আমাদের!
সাকরেদ।। (শেয়ার বার করে) কিনবে?
ডাক্তার।। (শেয়ার পকেটে রেখে, ঘড়ি বার করে) ডেলিভারি কেস
উঠে পড়েন।
ভিখিরি বাজনা বাজায়।
আগাথে।। মা আমার মরবার পথে
ডাক্তার চলে যান।
সাকরেদও পিছন পিছন
আগাথে।। বাঁচান আমায়!

আলেকজান্ডারের হাত ধরে। বেরিয়ে যায় তারা। অঙ্গভঙ্গি করে বোবা-কালা। 'খুন' লেখা পোস্টারটার দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

[মানুষ / অনুবাদক : শঙ্খ ঘোষ]

নাটকটিতে এভাবে স্টাকাটো-র গঠনে সংলাপ রচনা করা হয়েছে, যাতে সংক্ষিপ্ত ও বেশিরভাগক্ষেত্রে মোনোসিলেবিক বাক্যগুলির প্রতিটি শব্দে পৃথকভাবে অভিঘাত প্রযুক্ত হয়। শঙ্খ সেই ফর্মকে অপরিবর্তিত রেখেছেন তাঁর অনুবাদে। তাঁর 'আরোপ আর উদ্ভাবন' গ্রন্থের 'অলীক ভবিষ্যৎ' নিবন্ধে 'অলীকপ্রত্যাশী' কথাটি ফিরে ফিরে এসেছে। 'মানুষ' নাটকের গতিময়তা এই অলীকপ্রত্যাশাকেই হয়তো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

শঙ্খের আরেকটি নাটক 'ছোট্টো চারটি মেয়ে' অপেক্ষাকৃত স্বল্পপঠিত।

পাবলো পিকাসো-র লেখা 'দ্য ফোর লিটল গার্লস'-এর ইংরেজি অনুবাদ থেকে রূপান্তরিত এটি। পিকাসো চারের দশকে মোট দুটি নাটক রচনা করেছিলেন ফ্রেঞ্চ ভাষায়। একটি–ডিজায়ার কট বাই দ্য টেল। পরবর্তীতে ১৯৪৭-৪৮ নাগাদ লেখেন–দ্য ফোর লিটল গার্লস। মূলত সাররিয়েল ফর্মে লেখা এই নাটকে চারজন নামহীন বালিকা পরস্পরের মধ্যে সংলাপ আদানপ্রদান করতে থাকে। পিকাসো এদের এক-দুই-তিন-চার এভাবে চিহ্নিত করেছেন। শঙ্খ তাদের সংখ্যায় ব্যক্ত না করে লিখছেন প্রথমা-দ্বিতীয়া-তৃতীয়া-চতুর্থী।

তৃতীয়া।।

...(নৌকোর ওপর পুতুল সাজায়, ফুলের মালার বাধা, মাগুলে ঝুলিয়ে দেয় ওকে, মাটির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে নিজে ছাগটিলকে আদর করে।)

হে সুন্দর সুধা, সুদর্শন প্রিয়, প্রেরিত আধার, সূর্য আমার, বাসনা আর কী আমার, মত্ত ঘোড়া মিথ্যা আমার, আমার হাত মাখনদলা পঙ্কিলতার মতো, মেলার ঘূর্ণিচাকায় লাগা শিকল যেমন ওঠা নামার মনোহরণ আলকাতরা, পিপের ধূম্র চুল্লিবুকে পাখা সোনার মতো কোমল পারাবতের অ্যাসিড হয়ে বন্ধ মুখে কামড়ে দেওয়া লেবু।

(উঠে পড়ে, ছাগলটাকে খুলে নেয়, আর কেটে ফেলে ওর গলা, হাতে তুলে নেয় ওটা, আর নাচতে থাকে।)

প্রথমা, দ্বিতীয়া আর চতুর্থী।।

(বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে, দেখছে : মুহূর্তের জন্য তারা ভিতরে গিয়ে আবার ফিরে আসে। ঠোঁটের ওপর বিরাট বিরাট গোঁফ এঁকে আবার ছেড়ে দেয় একঝাঁক পায়রাকে, উড়ে যায় তারা। আর প্রথমা, দ্বিতীয়া আর চতুর্থী জানলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাগানে, কাঁধের ওপর জুড়ে নিয়েছে মস্ত খোলা পাখা, মরা ছাগল হাতে ধরা তৃতীয়াকে ঘেরাও করে তারা, ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে তাদের নিজের আবেষ্টনের মাঝখানে।

দ্বিতীয়া।।

দেখিয়ে দে আমাদের ওর বরফহিম গানের অন্ধ আলো আর ওর চলনশীল চাওয়ায় মেরুপ্রভা, যাতে আমাদের ওপর ফেটে পড়ে সাপের জোড়ার মতো, ঘূর্ণিকার আভা চিহ্নে চিহ্নে ভরা ওর হাত।

চতুর্থী।।

কপালে আমার গড়িয়ে যাক রক্ত, যাতে ওর উড়ে-যাওয়া জীবনের আয়নবায়ু শীতলতা অনুভব করতে পারি আমি।

দ্বিতীয়া।।

দানাবাঁধা বঙ্কিম রেখার অলস শিহরনে ফুটছে যে হিমের আগুন তার রুপোলি ঝুমকির মতো গলে যাক ওর চোখের চাওয়ার মর্মর।

চতুর্থী।।

আজ নিয়ে আসি কিছু মদ ওই কলসের থেকে, বিশাল বয়াম থেকে, আর আনি সব মদ, যাতে ও মাতাল হয়ে ওঠে ওর মৃত্যুতে, যাতে ও-ও গান গায় আমাদের সঙ্গে ভেসে ওঠে আর ভালোবেসে যায় আমাদের।

প্রথমা।।

নৌকা চলছে, ফুলছে, জাগছে, আলো করে দিচ্ছে সব দিক আর নিকেলনীল, লেবু, পান্না সবুজ, লাইলাক, গোলাপি আর আফিমফুলের লাল, শাদা মদের শিটা, আকাশনীলের গোলাপি, বহু রঙের পায়রা পালক আর লেবু, ছোট্ট কমলা আর মোসাম্বি আর তেতো কাঁচা কমলার রস খেতে চেয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার হাত।

দ্বিতীয়া।।

(নিহত ছাগের ক্ষতের ভিতর এক্কেবারে ঢুকিয়ে দেয় ছোট্ট হাত আর হৃৎপিণ্ড উপড়ে এনে দেখায় অন্য সঙ্গীদের।)

বেঁচে আছে–বেঁচে আছে–লাফাচ্ছে–হা! আমাকে ও মারছে দেখ কামড়াচ্ছে–টেনে নে রে আমার থেকে–গলার কাছে লাফাচ্ছে ও ছিঁড়ছে আমায়–গলা টিপছে–মার ওকে মার বেঁচে আছে।

[ছোট্টো চারটি মেয়ে / শঙ্খ ঘোষ]

মঞ্চাভিনয়ের জন্য নয়, নিবিষ্ট পাঠের জন্যই পিকাসো এই নাটক লিখেছিলেন বলে জানা যায়। শঙ্খের অনুবাদটিও সেই পাঠের প্রক্রিয়াকেই অব্যাহত রাখে। মানুষ ও ছোট্টো চারটি মেয়ে–কোনোটাই এখনো বাংলার মাটিতে মঞ্চস্থ হয়নি সম্ভবত।

অন্যদিকে, শঙ্খের অন্য দুটি নাটক অভিনীত হয়েছে বহু-বহুবার। দুটিই গিরিশ কারনাড–রচিত। একটি 'হয়বদন' ও অন্যটি 'রক্তকল্যাণ'। জার্মান ঔপন্যাসিক থমাস ম্যান 'কথাসরিৎসাগর'-এর কাহিনি অবলম্বনে লেখেন 'দ্য ট্রান্সপোজড হেড' নামক একটি উপন্যাস। এই উপন্যাস অবলম্বন করে গিরীশ ১৯৭১-এ কন্নড় ভাষায় লেখেন 'হয়বদন' নাটকটি। ১৯৭২-এ এর মঞ্চায়ন দেখে বিমুগ্ধ শঙ্খ ঘোষ ওই বছরই অনুবাদ করেন হয়বদনের। নাম অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু সহজবোধ্য সংলাপের আধারে গভীর চিন্তার বীজ গ্রোথিত করে শঙ্খ এই নাটককে করে তোলেন বাংলার মাটির, বাঙালি পাঠক তথা দর্শকের উপযোগী। এই নাটকের নির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায় তাই বিশ্বাস করেন, হয়বদন যতখানি গিরীশের, ততটাই শঙ্খ ঘোষেরও।

নাট্য-অনুবাদে শঙ্খের শেষ পূর্ণাঙ্গ কাজ 'রক্তকল্যাণ'। গিরিশ কারনাড 'তালেদণ্ড' নামে কন্নড় ভাষায় একটি নাটক লেখেন ১৯৮৯-এ। ১৯৯১-এ নাটকটির হিন্দি অনুবাদ করেন রামগোপাল বাজাজ, যা ১৯৯২-এর জানুয়ারি মাসে দিল্লিতে মঞ্চস্থ হয়। হিন্দি নাটকটির শিরোনাম ছল 'রক্তকল্যাণ'। ভক্তি আন্দোলনের সাধক বাসবেশ্বর এই নাটকের প্রোটাগনিস্ট। সমগ্র নাটকটি আবর্তিত হতে থাকে ধর্মীয় বিভাজন তথা শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে বাসবান্না ও রাজা বিজ্জলের প্রগাঢ় বন্ধুতা এবং মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে। ১৯৯২ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বছর। স্বভাবতই, একজন সৃষ্টিশীলের প্রতিক্রিয়ার ভাষা ব্যক্ত হয় তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। ১৯৯৩-এ শঙ্খ অনুভব করেন 'রক্তকল্যাণ'-কে বাংলার মাটিতে আনার প্রয়োজনীয়তা। গিরীশের নিজেরই করা ইংরেজি অনুবাদটি থেকে শঙ্খ ঘোষ রক্তকল্যাণের রূপান্তর ঘটান বাংলায়। ১৯৯৪-৯৫-তে যথাক্রমে পত্রিকায় ও গ্রন্থ হিসেবে নাটকটি প্রকাশিত হয়। মঞ্চস্থ হয় সীমা মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়। বলা বাহুল্য, এই কাজটির জন্যই শঙ্খ ঘোষ অনুবাদ সাহিত্যে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পা রেখে বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে রক্তকল্যাণ যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে এ কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু এই গদ্যরচনা শুরু হয়েছিল কিছু দৃষ্টিহীন শিল্পীর 'রক্তকরবী' নাটকে অভিনয়-প্রসঙ্গ দিয়ে। তৎকালীন 'ব্লাইন্ড অপেরা' নামের ওই দলটির পুরোধায় ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। আজও আছেন। আছেন দৃষ্টিহীন সব নিরহং শিল্পীরা। এখন তাঁদের দলের নাম 'শ্যামবাজার অন্যদেশ'। তাঁদের নিরলস নাট্যসাধনা নিয়ে সম্প্রতি তৈরি হয়েছে একটি তথ্যচিত্র যার নাম 'এইটথ ডে অফ দ্য উইক': পরিচালক শোভন তরফদার। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে শঙ্খ-স্পর্শের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে শুভাশিস লিখছেন :

'রবীন্দ্রনাথের নাটকের কাছে পৌঁছে তাদের মনে পড়ে গেল–সবচেয়ে আগে শম্ভু মিত্রের কথা। বহুরূপীর কথা।

এতদিন ধরে সর্বক্ষণের নাট্যচর্চায় মানে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা ইস্তক প্রায় ওই সমস্ত দৃষ্টিহীন যুবক যুবতীরা, যারা তখন অনেকেই সদ্য ইস্কুল পাশ করা কিংবা কলেজের ছাত্রছাত্রী, লেগে থাকত তাদের জীবনের এই নতুন খেলনাটি যার নাম থিয়েটার, তারই নেশায় কিংবা আবিষ্কারে। তারা ইতিমধ্যেই–জেনেছিল–'বহুরূপী' সম্প্রদায় কিংবা মানুষ-অভিনেতা শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র মহাশয়রাই এই বাংলাদেশকে রবীন্দ্রনাথের নাটক একদিন পড়তে শুনতে দেখতে শিখিয়েছিলেন। কিংবা আরও একজন কবি-শিক্ষক 'শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষও' রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে জানতে বুঝতে নিজেদের সহজ উপলব্ধির দৈনন্দিন জগতের মধ্যে টেনে এনে তিনিই শিখিয়েছিলেন–কেমন করে ওই নাটকগুলোর মধ্যেই রয়ে গেছে এক অন্য রকম 'দেখার দৃষ্টি'। 'জানার বোধ'। অন্ধের স্পর্শের মতো আশ্চর্য জ্ঞান।'

শঙ্খের নাট্যচেতনা চক্ষুহীন কিংবা চক্ষুষ্মান পাঠক ও দর্শককে ক্রমাগত সেই দৃষ্টির, বোধের, জ্ঞানের আলোকসন্ধানের পথে নিয়ে যায়।

অবন্তিকা পাল ॥ কবি ও প্রাবন্ধিক

ফিস টোম্যাটো স্টাফড

স্ট্রবেরি মিঠাই-স্যান্ডুইচ

জাফরান চিকেন

স্পাইসি ক্যাবেজ রাইস

হেঁসেলঘর

রসনায় বৈশাখ

পুরনোকে বিদায় জানিয়ে হৈ হৈ করে এসে পড়ল বাংলা নববর্ষ ১৪২৯। সঙ্গে নতুন আশা, উদ্দীপনা এবং অবশ্যই বাঙালির চিরদিনের, চিরপ্রিয়– মাছ-মিষ্টি-চিকেন। তিন অভিবাসী বাঙালি বৈশাখের রসনাতৃপ্তির খবর দিয়েছেন

ফিস টোম্যাটো স্টাফড

উপকরণ

- টোম্যাটো (৪টে বড় সাইজের)
- রুই অথবা কাতলা মাছের পেটি (৪টে কাঁটা ছাড়ানো)
- ১টা পেঁয়াজ (কুচনো)
- আদা বাটা (এক টেবল-চামচ)
- রসুন বাটা (এক টেবল-চামচ)
- ২টি কাঁচালঙ্কা কুচনো
- ধনেপাতা কুচনো (২ টেবল-চামচ)
- গরমমশলা গুঁড়ো (আধ চা-চামচ)
- গোলমরিচ গুঁড়ো (এক চা-চামচ)
- সর্ষে অথবা সাদা তেল (আধ কাপ)
- নুন স্বাদ মত

গ্রেভির উপকরণ

- পেঁয়াজ বাটা (আধ টেবল-চামচ)
- রসুন বাটা (আধ টেবল-চামচ)
- আদা বাটা (আধ টেবল-চামচ)
- হলুদ গুঁড়ো (আধ চা-চামচ)
- চিনি (আধ চা-চামচ)
- নুন স্বাদ মত

প্রণালী

- প্যানে অথবা কড়াইতে তেল গরম হলে মাছগুলো হাল্কা করে ভেজে নিতে হবে। মাছের কাঁটা এবং ছাল ছাড়িয়ে নিতে হবে।
- টোম্যাটোগুলোর মাথা গোল গোল করে কেটে নিতে হবে। মাথাগুলো ফেলবেন না। টোম্যাটোগুলোর ভেতর পরিষ্কার করে দানা বের করে নিতে হবে।
- আর একটা প্যানে অথবা কড়াইতে মাছ ভাজার কিছুটা তেলেই কুচনো পেঁয়াজটা ভাজতে হবে। ভাল করে ভাজা হলে তাতে আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে কষতে হবে। এবার বাকি মশলাগুলোও একে একে দিয়ে ভাল করে কষতে থাকুন।
- মাছগুলো মশলার মধ্যে দিয়ে ভাল করে নাড়তে থাকুন। একটু মিশে গেলেই মাছের পুর তৈরি।
- টোম্যাটোগুলোর ভিতরে অল্প নুন বুলিয়ে নিতে হবে। চামচ করে আস্তে আস্তে টোম্যাটোগুলোর মধ্যে পুর ভরতে হবে। পুর ভরা হয়ে গেলে টোম্যাটোর মাথাটা আলতো করে লাগিয়ে দিয়ে উপর থেকে একটা টুথপিক লাগিয়ে দিতে হবে যাতে খুলে না যায়।
- কড়াই অথবা প্যানে বাকি মাছ ভাজার তেলটা দিয়ে দিন। তেলটা গরম হলে তাতে পেঁয়াজ এবং আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে কষতে থাকুন। তেল ছাড়তে শুরু করলে তাতে একে একে হলুদ গুঁড়ো, নুন এবং চিনি দিতে হবে। টোম্যাটোর ভিতরের রসটা দিয়ে দিন। আঁচটা কমিয়ে দিন।
- ফুটে উঠলে একটা একটা করে পুরভরা টোম্যাটোগুলো দিয়ে দিন। কড়াই অথবা প্যান ঢাকা দিয়ে দিন। পাঁচ মিনিট রেখে টোম্যাটোগুলো উল্টে দিন।
- দু'মিনিট পর টোম্যাটোগুলোর খোসা অল্প কুঁচকে গেলে এবং গ্রেভিটি ঘন হয়ে গেলে বুঝবেন আপনার ফিস টোম্যাটো স্টাফড তৈরি। কুচনো ধনে পাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন ফিস টোম্যাটো স্টাফড।

সঞ্চিতা মোহান্তি টরেন্টো (কানাডা)

জাফরান চিকেন

উপকরণ

- চিকেন (হাড় শুদ্ধ বা বোনলেস) ১ কেজি
- পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ
- রসুন বাটা ১ টেবল-চামচ
- আদা বাটা ১ টেবল-চামচ
- গোটা গরমমশলা (এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা)
- গোটা জিরে ১ চিমটি
- জাফরান ১ চিমটি
- দুধ ১/২ কাপ
- কাঁচালঙ্কা ৩-৪ টে
- টোম্যাটো বাটা ২ বড় চামচ
- নুন স্বাদ মত

- চিনি সামান্য
- গোলমরিচ গুঁড়ো আধ চা-চামচ, ঘি সামান্য
- ধনে পাতা কুচি করে কাটা

প্রণালী

১. দুধে জাফরান ভিজিয়ে রেখে দিতে হবে।
২. রসুন, আদা, নুন, চিনি এবং অল্প কাঁচালঙ্কা মাখিয়ে চিকেনটি ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে অনন্ত ২-৩ ঘণ্টা।
৩. কড়াইতে তেল গরম করে গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে এতে একটি কাঁচালঙ্কা ছেড়ে ভেজে নিতে হবে।
৪. পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভাল করে কষতে হবে। চিকেনের মিশ্রণটি দিয়ে ভাল করে ভাজতে দিয়ে হবে। আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে অল্প কিছু ক্ষণ।
৫. চিকেন সেদ্ধ হয়ে এলে টোম্যাটো বাটা দিতে কষে গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে নাড়িয়ে নিতে হবে।
৬. এ বার এতে দুধ এ মেশানো জাফরান দিয়ে নাড়িয়ে নিতে হবে।
৭. ঢাকা দিয়ে ৪-৫ মিনিট ফোটালেই তৈরি জাফরান চিকেন।
৮. উপর থেকে ধনে পাতা কুচি, ঘি ও জাফরান ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

স্পাইসি ক্যাবেজ রাইস

উপকরণ

- বাসমতি চাল ৫০০ গ্রাম
- বাঁধাকপি (লম্বা করে কুচানো) ২ কাপ
- গোটা সর্ষে ১ চামচ
- গোটা জিরে ১ চামচ
- হিং ১ চিমটে
- রসুন কুচি ১ চামচ
- কারিপাতা ৪/৫ টি
- ধনে পাতা কুচি ২ চামচ
- লঙ্কা গুঁড়ো/কুচানো কাঁচা লংকা ২ চামচ
- হলুদ গুঁড়ো অর্ধেক চামচ
- ধনে গুঁড়ো ১ চামচ
- জিরে গুঁড়ো ১ চামচ
- পাতিলেবুর রস আন্দাজ মত
- নুন স্বাদমত
- কাঠ বাদাম ২ চামচ
- কড়াইশুঁটি ২ চামচ
- সাদা তেল ২৫ গ্রাম

প্রণালী

প্রথমে চালটা অল্প শক্ত রেখে ভাতটা করে নিন। কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে বাদামগুলো লাল লাল করে ভেজে রাখুন। এর পর কড়াইতে তিন চামচ তেল দিন। তেল গরম হলে আঁচ কমিয়ে দিয়ে সর্ষে, জিরে ও হিং ফোড়ন দিন। ২ মিনিট পর কুচানো রসুনগুলো দিয়ে দিন।

অল্প লাল হয়ে এলে কারিপাতা দিয়ে দিন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঁধা কপি দিয়ে সামান্য লবণ ছড়িয়ে দিয়ে নেড়ে-চেড়ে চাপা দিয়ে দিন।

১০ মিনিট মত হওয়ার পর ভাতটা দিয়ে দিন এবং তার উপর লঙ্কা, হলুদ ও লেবুর রস ছড়িয়ে দিন। আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে নাড়তে থাকুন।

২ মিনিট পর আঁচ কমিয়ে ধনের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো ও মটরশুটি মিশিয়ে চাপা দিন।

প্রায় ৫/৭ মিনিট পর চেখে দেখে লবন ও ঝাল দিতে পারেন। আঁচ বন্ধ করে দিয়ে কুচনো ধনে পাতা ও বাদাম ছড়িয়ে দিয়ে কষা মাংসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সায়ন্তী ভট্টাচার্য সুইডেন

স্ট্রবেরি মিঠাই-স্যান্ডুইচ

উপকরণ ছানার মিষ্টি বানানোর জন্য

- দুধ ১ লিটার
- ছানা অথবা পনির (১ লিটার দুধ থেকে বানানো)
- কন্ডেন্সড মিল্ক ২ কাপ
- ভ্যানিলা (১/২ চামচ)
- আলমন্ড
- পেস্তা
- স্ট্রবেরি

প্রণালী

ছানার মিষ্টি বানানোর জন্য

প্রথমে একটা বড় পাত্রে দুধ ফুটতে দিন। দুধ ফুটে ঘন হয়ে এলে তাতে ছানা অথবা পনির গুঁড়ো করে মেশান এবং নাড়তে থাকুন।

দুধ ফুটে ৩/৪ হয়ে এলে তাতে কন্ডেন্সড মিল্ক মিশিয়ে নাড়তে থাকুন যত ক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত মিশ্রণটি ফুটে শুকনো মিষ্টির রূপে পরিণত হয়।

এবার এতে ১/২ চামচ ভ্যানিলা যোগ করে মিশিয়ে দিন। সব শেষে আলমন্ড ও পেস্তা গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিন।

এবার একটি চৌকো আকৃতির প্লেটে শুকনো মিষ্টির এই মিশ্রণটি রেখে উপর থেকে স্প্যাচুলা দিয়ে সমান করে দিন এবং ফ্রিজে ৪-৫ ঘণ্টা রেখে দিন।

গাজরের পুর বানানোর জন্য

- গাজর কোরা (৫টা বড় গাজর)
- দুধ (২ কাপ ঘন)
- গুড় (আখের গুড় ২ কাপ)
- দেশি ঘি (৫ চামচ)
- এলাচ গুঁড়ো
- কাজুবাদাম গুঁড়ো

প্রণালী

গাজরের পুর বানানোর জন্য

একটা ননস্টিক ফ্রাইপ্যানে প্রথমে ঘি দিয়ে তার পর তাতে কোরা-গাজর দিয়ে ভাল ভাবে নাড়তে থাকুন। ২০-২৫ মিনিট পর গুড় যোগ করে পুনরায় নাড়তে থাকুন এবং দুধ যোগ করে কম আঁচে রান্না করুন। আরও ১৫ -২০ মিনিট পর মিশ্রণটি শুকনো এবং লালচে হয়ে এলে এলাচ গুঁড়ো এবং কাজুবাদাম গুঁড়ো মিশিয়ে নামিয়ে নিন।

একটি প্লেটে পুরটি ঢেলে উপর থেকে স্প্যাচুলা দিয়ে সমান করে দিন এবং ফ্রিজে ৪-৫ ঘণ্টা রেখে দিন।

স্ট্রবেরি মিঠাই-স্যান্ডুইচ এর জন্য

এ বার ফ্রিজ থেকে প্লেটগুলো বার করে ছুরি দিয়ে চৌকো আকারের সমান টুকরো করুন। একটা স্ট্রবেরিকে সমানভাবে লম্বালম্বি করে দু'টুকরো করুন।

তারপর একটা টুথপিক এর মধ্যে প্রথমে এক টুকরো স্ট্রবেরি, এক টুকরো ছানার মিষ্টি, এক টুকরো গাজরের পুর, আর এক টুকরো ছানার মিষ্টি এবং শেষে বাকি আরও এক টুকরো স্ট্রবেরি যোগ করুন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল স্ট্রবেরি মিঠাই-স্যান্ডুইচ।

অমৃতা পাল কানাডা

বেলাল চৌধুরী

স্মরণ

পিতা বেলাল চৌধুরীর রৌদ্রছায়ায়

প্রতীক চৌধুরী

এই পৃথিবীকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলতে প্রকৃতি যেমন প্রতিনিয়ত তার সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চলেছে, তেমনিভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে রঙের ছটায় ভরিয়ে দিতে যুগে যুগে এমন কিছু চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের যাপিত জীবনের ছত্রে ছত্রে বাঁক পরিবর্তন পারিপার্শ্বিক সকলকে বিমোহিত করে রেখেছিল মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়। জীবনের সেইসব বাঁক পরিবর্তনের পিছনে ক্রীড়নক হিসেবে ভূমিকা রেখেছিল কখনো ব্যক্তি মানুষের অসম্ভব রকমের মানসিক শক্তি, কখনো-বা অদৃষ্টের বিধান। কবি বেলাল চৌধুরীকে যারা কাছ থেকে চিনতেন, জানতেন, তারা সকলেই অবগত আছেন যে, বাহ্যিকভাবে প্রচণ্ড উদাসীন এই কবি জীবদ্দশায় এই উভয় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন খুব অনায়াসে।

জাদুবাস্তবতার একজন অনুরাগী হিসেবে কি না জানি না, নিজের জন্য তৈরি করেছিলেন এক জাদুবাস্তবতার জগৎ। যে জগতে তিনি প্রবেশ করতে পারতেন অবাধে, যে কোনো পরিবেশ-পরিস্থিতিতে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ধরে কুমিল্লা জেলার যেখানে শেষ এবং ফেণী জেলার শুরু, সেখানেই কোনো এক চৌকস শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মতোন ছোট্ট গ্রামের নাম 'শর্শদী'। সেই গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের নয় সন্তানের সর্বজ্যেষ্ঠ হিসেবে কবি বেলাল চৌধুরীর জন্ম। পরিবারটির মধ্যে প্রখর ধর্মীয় মূল্যবোধের আবহ থাকলেও আধুনিক চিন্তামনস্ক পরিবার হিসেবে ছিল সুপরিচিত। বাবা রফিকউদ্দিন আহমদ চৌধুরী তৎকালীন ব্রিটিশ রেলের কর্মকর্তা হওয়ায় সুবাদে সেইসময় কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত প্রায় সব পত্র-পত্রিকা, বই নিয়মিত সংগ্রহ করতেন। মা মনিরা আখতার খাতুন চৌধুরী লিখতেন কবিতা। সেইসব বই, পত্র-পত্রিকা আর কবিতার মাঝে বেড়ে ওঠা আশৈশব দুরন্ত কবি ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতেন রেলগাড়ির চালক হবার। শৈশবের সেই স্বপ্নের ঘোর কাটতে না কাটতেই প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠেন বাম রাজনীতির প্রতি। সেই আগ্রহ ধীরে ধীরে তাকে রূপান্তরিত করেছিল একেবারে সক্রিয় বাম রাজনৈতিক কর্মীতে। ফলস্বরূপ ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সেই উত্তাল সময়ে তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার রোষানলে পড়ে যেতে হয় দীর্ঘ কারাবাসে। রাজবন্দি থেকেই বিশেষ ব্যবস্থায় দিয়েছিলেন তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। তারপর কারামুক্ত হয়ে বিভিন্ন ঘটনার ধারাবাহিকতায় পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত প্রবল 'পাঠস্পৃহা' মাদুলির ন্যায় বুকে ধারণ করে এবং যৌবনের মন্ত্র 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্ট মন্দির'কে ভরসা করে পাড়ি জমান অজানার উদ্দেশে। ট্রলারে চেপে কখনো গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, কখনো কুমিরের ব্যবসা (অনেকের মতে কুমিরের চোখের জলের ব্যবসা) এরকম নানা মিথের জন্ম দিয়ে এবং ব্যবসার সুবাদে পকেটে বেশ কিছু কাঁচাপয়সাসমেত একসময় নিজের পরিচয় ঝেড়ে ফেলে নেমে পড়লেন কলকাতায় ১৯৬৩ সালে। মিশে গেলেন সেখানকার শিল্প-সাহিত্যের নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে। সেসময়কার দেখা বেলাল চৌধুরীকে নিয়ে কবি-ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়ান–'জল যেমন জলকে টানে, সেইভাবে বেলাল চৌধুরী যুক্ত হয়ে গেছে কফি হাউসের কবির দঙ্গলে। পাকিস্তানের সঙ্গে তখন ভারতের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে দিনকে দিন, কয়েক মাস পরেই শুরু হবে একটি বালখিল্যসুলভ যুদ্ধ, সেরকম আবহাওয়ায় পাকিস্তানের নাগরিক হয়েও সহায়সম্বলহীন অবস্থায় কলকাতায় বিচরণ করার জন্য প্রচণ্ড মনের জোর ও সাহসের দরকার।

অবশ্য বেলালের একটা দারুণ সম্পদ ছিল, সেটা তার মুখের হাসি এবং সহজ আন্তরিকতায় মানুষকে আপন করে নেবার ক্ষমতা। পরে অনেকবার দেখেছি, যেকোনো বাড়িতে গেলে সে পরিবারের বাচ্চা ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে বুড়ো-বুড়িরা পর্যন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলালকে ভালোবেসে ফেলে।'

কবি বেলাল চৌধুরীর জীবনের কলকাতা পর্ব অনুসন্ধানী পাঠকদের অনেকেরই কমবেশি জানা। সেখানকার প্রবাদ-প্রতিম সাহিত্যিকদের অনেকের রচিত উপন্যাস, গল্প, কবিতা এবং আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে তৎকালীন কবি বেলাল চৌধুরীর রহস্যময়, বিচিত্র, বোহেমিয়ান জীবনচরিত। বাউণ্ডুলেপনায়, বেলাল অনেকখানি হার মানিয়ে দিয়েছিল তখনকার কলকাতা দোর্দণ্ডপ্রতাপে দাপিয়ে বেড়ানো শক্তি চট্টোপাধ্যায়কেও–একথা বন্ধুমহলে বেশ প্রচলিত ছিল। মূলত তখনই আত্মপরিচয়ের সংকট ঘোচাতে সক্রিয় লেখালেখির শুরু। ছোট বড় নানান পত্রিকা-সংকলনে দুহাতে লিখেছেন কবিতা, গদ্যনির্ঝর। সমানতালে করেছেন তরজমা কিংবা সম্পাদনার কাজ। সেসময়েই সম্পাদনা করেছিলেন তরুণ কবিদের কাছে ধর্মগ্রন্থের ন্যায় সমাদৃত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা। তার লেখা সেসময়কার কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো কাব্যানুরাগীদের। বেলাল চৌধুরীর কবিতা সম্পর্কে কবি শামসুর রাহমান লিখেছিলেন 'তিনি কখনো কবিতার বাঁধা সড়কে হাঁটেন না, একটু অন্যরকম লিখতে চেষ্টা করেন এবং তাঁর কবিতায় কথ্যচ্ছলে ফুটে ওঠে স্বকালের বিচূর্ণিত রূপ, তার মর্মমূল-ছেঁড়া আর্তনাদ।' একথা সত্যি যে বেলাল চৌধুরীর কবিতার প্রস্তুতিপর্ব কলকাতার কবি বন্ধুদের সান্নিধ্যে সেই উন্মাতাল সময়েই ঘটেছিল, কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর প্রকৃত মৌলিক বিকাশ ঘটেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে। তাঁর সেসময়কার রচিত কবিতায় বরাবরই সুর-লয়-ছন্দ-তালের যোগসূত্র ঘটিয়েছে এদেশের মানুষ এবং মানুষের মুক্তির সংগ্রাম, গ্রামের মেঠো পথ, মাটির সোঁদা গন্ধ, নদীর কলতান, ফসলের শোভা, গাছের ছায়ায় রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা প্রভৃতি বিষয়।

জীবনের বেলা যত বেড়েছে, ততই দীর্ঘতর হয়েছে কবি বেলাল চৌধুরীর বন্ধুত্বের তালিকা। অন্যভাবে বলা যায়, তিনিই আজীবন অবারিত রেখেছেন বন্ধুত্বের বাতায়ন, বাছবিচার ব্যতিরেক। আর সেই বন্ধুত্বের ধরনও ছিলো একেবারে শরতের পরিষ্কার আকাশ। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এসব সম্পর্কের যোগসূত্র হিসেবে শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, সৃজনশীলতা, মুক্তচিন্তা ও এদেশের ভাষা কিংবা মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে দাঁড় করাতেই পারেন। তবে একথাও সত্য যে, এই সব সম্পর্কে কখনো প্রশ্রয় পায়নি ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ অথবা বর্ণবাদ।

এক আশ্চর্য রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী কবি বেলাল চৌধুরী তাঁর জ্ঞান, সুমধুর ভাষার ব্যবহার ও হৃদয়ের প্রস্তুতা দিয়ে যেমন জয় করে নিয়েছিলেন দেশ বিদেশের খ্যাতিমান নক্ষত্রপুঞ্জদের মন, তেমনি সরল ভালোবাসার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন কাঁচা বাজারের সব্জি বিক্রেতা সুলতান মিঞা থেকে শুরু করে পুরানা পল্টন-সেগুনবাগিচা এলাকার পুরাতন বইয়ের ব্যবসায়ী বাচ্চু মিঞাদের মতোন অতি সাধারণ মানুষদের। বন্ধু-বান্ধব ও আড্ডা ছিল কবির জীবনের একটি বিশাল অংশ জুড়ে। 'জার্নিম্যান বুকস' থেকে প্রকাশিত কবিকে লেখা দুই বাংলার কবি-লেখকদের পত্রগুচ্ছের সংকলন 'প্রাণের পত্রাবলি' যার স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণের স্বাক্ষর বহন করে। যেখানে কবিরবি শামসুর রাহমান কবিকে প্রেরিত একটি পত্রে লিখেছেন–'আপনার কর্মস্থলে (তৎকালীন ভারত বিচিত্রার অফিস) নিশ্চয়ই আগের মতো আড্ডা জমে নিয়মিত। আমি এখন খুবই নিঃসঙ্গ, আপনাদের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত। এই নিয়ে হা-পিত্যেশ করি না; তবে আপনাদের নৈকট্য আমাকে আনন্দ দেয়, জানবেন।' কবিবন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন–'তোমার আরেকটি আমন্ত্রণ কলকাতায়। জুলাই মাসে 'কৃত্তিবাস'-এর পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে তিন দিনের একটা উৎসব ও হৈ চৈ করা হবে ঠিক হয়েছে। তোমার উপস্থিতি ছাড়া সেটা জমবে কী করে?' কথাসাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি পত্রে যেমন অভিমান করে লেখা–'তোমার আসলে আমাকে ভালো লাগে না–আমি এটা বুঝতে পেরেছি।' তেমনি আরেকটি পত্রে ভালোবাসার আবেগে লিখেছেন–'এবার বাংলাদেশে গিয়ে আমার বারবার কান্না এসেছে। তোমাদের ছেড়ে আসি কি করে? তোমার মুখখানি-লাল-কখনো-শুভ্র-কখনো মনে হয় এ মুখ না জানি কত কিছু জানে। তবু চুপ করে থাকে। আমাদের বাচালতা দেখে গভীরে হাসে।' এইসব চিঠিপত্র কবি বেলাল চৌধুরীর বন্ধুবাৎসল্যের প্রমাণ বহন করে বৈকি।

কবি বেলাল চৌধুরীর জীবনের আরেকটি বড় আংশজুড়ে রয়েছে বই। কবি বেলাল চৌধুরীকে নিয়ে তাঁর পরিচিত মহলের সবচেয়ে চেনা চিত্রটি ছিল, ঘাবড়ে যাবার মতন, উপচে পড়া বইপত্রের মাঝে, ঘরের আকারের সাথে বেমানান একটি বিশালাকার টেবিলকে সামনে নিয়ে বসে তিনি লিখেছেন বা পড়ছেন। আর পরিবারের মানুষদের কাছে এই দৃশ্যটি দেখার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। এক জীবনে সংগ্রহ করা বই বলতে এখনকার শিক্ষিত সমাজের বৈঠকখানায় পরিপাটি করে রেকে সাজানো বইয়ের মতোন নয়। একমাত্র স্নানঘর ছাড়া সকল কামরার দেয়াল দেখাই দুষ্কর ছিল, এমনকি রান্নাঘরের স্থানও কখনো কখনো দখল করে নিত বই। বাংলাদেশ এবং ভারত তো ছিলই, পৃথিবীর উন্নত অনুন্নত যত দেশ ভ্রমণ করেছেন তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু আবর্তিত হতো সেসব দেশের নতুন এবং পুরাতন বইয়ের দোকানে। বেছে বেছে সংগ্রহ করতেন পছন্দের বিরল সেই সব বই। তাছাড়া সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবির বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-অনাত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকেই ছিলেন তাঁর সংগৃহীত বইয়ের যোগানদারের তালিকায়। তাঁর সংগৃহীত বই ও পাঠের ব্যাপকতা নিয়ে সবিস্তারে লিখেছেন কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'অর্ধেক জীবন' নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসহ বেশ কিছু লেখায়। তবে যে সময় এই অঞ্চলে ইন্টারনেটের ব্যবহার ছিল অজানা, কিংবা মিডিয়ার প্রসারও ছিল না এত ব্যাপক, সে সময় কবি বেলাল চৌধুরীর সমগ্র বিশ্বের বিচিত্র সব বই এবং বিশ্বসাহিত্যের দখল, খবরাখবর ও সংগ্রহ নিয়ে সম্ভবত সবচেয়ে তথ্য-বহুল আলোচনাটি করেছেন বাংলা সাহিত্যের আরেক মহিরুহ প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, কবির প্রয়াণের পর তাঁকে নিয়ে জাতীয় কবিতা পরিষদের আয়োজিত শোকসভায়।

২০১৮ সালের ২৪ শে এপ্রিল দীর্ঘ চার বছর নানান ধরনের বার্ধক্যজনিত রোগের সাথে বোঝাপড়া শেষে জীবনে সর্বশেষ বাঁক বদল করে কবি বেলাল চৌধুরী যাত্রা করলেন অনন্তের পথে। সাথে নিয়ে গেলেন মানুষের ভালোবাসা। যার প্রমাণ পাওয়া যায় সেসময়কার জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, ডিজিটাল গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রচার ও প্রচারণায় এবং অসংখ্য মানুষের শোকগাথা বা স্মৃতিচারণে। কবির সারাজীবনে, বিশেষ করে শেষ চার বছরের অসুস্থতার সময় থেকে শেষ যাত্রা পর্যন্ত তাঁর বন্ধু-বান্ধব বা শুভানুধ্যায়ীদের তাঁকে নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, সহযোগিতা ও ভালোবাসার কথা লিখতে গেলে আয়তনে তা একটি ঢাউস উপন্যাসকেও পেছনে ফেলবে। তেমনি আরেকটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করা যায় শুধু কবি বেলাল চৌধুরী ও তাঁর সংগৃহীত বইয়ের আখ্যানকে বিষয়বস্তু করে। সে দায়িত্ব আপাতত ভবিষ্যৎ সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে পরিশেষে একটি তথ্য দিয়ে এই লেখাটির যবনিকা টানা যেতে পারে। কবির পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, এক সময় বিরক্তির উদ্রেক মনে হওয়া তাঁর সংগৃহীত বইয়ের বিপুল ভান্ডারটি ধীরে ধীরে অমূল্য রত্নখনি হয়ে উঠেছে। শুধু বিচিত্র জ্ঞানের আধার বা বিরল সংগ্রহের কারণে নয়, এই বইগুলোর প্রতিটির মধ্যে পাওয়া যায় একজন বৈচিত্র্যময় কবির সমগ্র জীবনের স্মৃতিমাখা ঘ্রাণ, অনুভব করা যায় হারিয়ে যাওয়া জনকের স্পর্শ।

সমগ্র জীবন মানুষের ভালোবাসা সাথে নিয়ে চলা, এমনকি চিরপ্রস্থানেও সেই ভালোবাসা সাথে নিয়ে যাওয়া কবি বেলাল চৌধুরীর ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী গত হলো এবছরের এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখ। তাঁর ভালোবাসায় সিক্ত পরবর্তী প্রজন্মের কবি ও সাহিত্য-কর্মীরা দিনটিতে তাঁকে স্মরণ করেন নিজ নিজ অবস্থান থেকে। কবির সন্তান হিসেবে আমরা তিন ভাই-বোন প্রাত্যহিক জীবনের চলার পথে মর্মে মর্মে অনুভব করি, আমাদের চারপাশের জগৎ পরিপূর্ণ হয়ে আছে কত মানুষের ভালোবাসায়, যাদের সকলেই কোনো না কোনো ভাবে বাবার ভালোবাসার বলয়ে সম্পৃক্ত ছিলেন। এভাবেই আমাদের জীবন প্রবহমান হয়ে চলেছে প্রয়াত পিতার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে যাওয়া ভালোবাসার মুক্তো মাণিক্য সাথে করে।

প্রতীক চৌধুরী ॥ কবিপুত্র

কবিতা

সুধীর দত্ত
সমুদ্র ও ফেনাপুঞ্জ

১.
অসম্ভবের কোনো অর্থ নেই, গুহ্য এক রহস্য মাখানো ভাঁড়ামি।
এক বাদ্যযন্ত্র, যে আমাকে ব্যবহার করে, আমি
শুধু শূন্য হই,
হাপরের মতো কোনো ভুতুড়ে নির্মাণ হাওয়া দেয়, ফুঁসে ওঠে
কয়লার ভিতর অলৌকিক
আভা, উজ্জ্বলতা আর আমাদের আত্মহত্যা, ক্ষত। অন্তঃসারশূন্য
নয় এইসব টুকরো ও উল্লাস।
ভিতরে ধ্যানের মতো স্তব্ধ এক ধ্যান জেগে থাকে।

২.
তোমার পায়ের নিচে কোথাও শিকড় নেই। ভাসমান
মেঘমালা সদৃশ উড়াল।
শুধু এক অবস্থান, আছি, বিস্ফারিত গুঞ্জন, ধ্বনির
মধ্যে, তারও অতীত এক পাখি, ডানার ঝাপটে
শব্দ হয়ে ঝরে পড়ে, নড়ে ওঠে, রেখার আঁচড় হয়,
দৃশ্যকাব্য, গান হয়ে ওঠে।

খালেদ হোসাইন
বেঁচে থাকা না-থাকা

১.
অনেকেই নেই তবু অনেকেই আছে
অনেকেই দূরে আছে, কেউ কেউ কাছে
অনেকেই সরে গেছে, গেছে কেউ ঝরে
কেউ কেউ মরে গেছে–তবু অন্তরে

থেকে গেছে, থেকে যাবে, যতদিন বাঁচি
আমি কি তোমার মনে আজও বেঁচে আছি?

২.
বেঁচে থাকা না-থাকায় এত কী তফাৎ?
তফাৎ কিছুই নেই মিছে প্রাণপাত।
সকলেই জানে তবে কেউ কি তা মানে?
কীসের আমেজ খোঁজে বাতাসের ঘ্রাণে?

জানা ভালো, তারচেয়ে ভালো না-জানাও
আত্মায় ইচ্ছের নিশান টানাও।

নীলাব্জ চক্রবর্তী
অথবা একটি ওপেন-এন্ডেড উইকেন্ড

শব্দ একটি ভ্রম হয়ে সময় সময় এই তো আড়াই নম্বরের সিগনাল অর্থে এক পা এক পা করে চার মিনিটের সবুজ জাম্পকাটের যে টেকনিক এক্সপ্রেসওয়ে বরাবর ব্যাকস্পেস ব্যাকস্পেস মারতেই ব্যর্থ কবিতার সব শাঁসজল লো-রাইজ জিনস জিন সাবলাইম তদনুরূপ ধ্বনিতে আদৌ যে সহনীয় অথচ ক্ষণে ছায়া পালটে নেওয়ার কথা ছিল কার সাথে চোখের অর্ধেক ঈষৎ যৌন স্বাদ যে ক্রিয়া লেফট টার্ন লেফট টার্ন নিতে স্বপ্নের তৃতীয় অঙ্কে বীজ এলো ধ্বনির বাইরে স্বেদ ও শোণিতের স্মৃতিতে যে ভাষার ছবি ফুটফুট করে একটা অভিজ্ঞতা অবধি স্টেজ বা অফিসগেটের কাহন দুলছে রোদে প্রায় ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট ছিঁড়ে ক্যালেন্ডারে ক্যালেন্ডারে গলে যাচ্ছে দ্বিধার নামে এই অননুমতি কোথায় পৌঁছবে স্ক্রিনশট অথবা টাইটেল কার্ড অথবা...

সৌমনা দাশগুপ্ত
গুরাশের মদ

নদীর ওপরে পর্দা টেনে দিতে দিতে
আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠল আয়না
আর সাদা-কালো ছবির রাশ গড়িয়ে যাচ্ছে
গড়িয়ে যাচ্ছে জল আর মেপলের পচা পাতা

তোমার দুচোখে ভেসে তোমারই চোখের ছায়া
তোমার উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু চুয়ে
হিংস্র কুকুর যেন কেবল-ফল্টের পর অন্ধকারে
এগিয়ে চলেছে দৃষ্টিসীমা পার করে
অদেখা শিকারের দিকে ঝিকিয়ে উঠছে জিভ

গলে পড়ে রডোডেনড্রন
গুরাশের মদে তাজা রক্ত মিশে যায়

প্যালেটে প্যালেটে ও কী সাজিয়েছ
লবণে জারানো মাছ, নোনা গন্ধ, নেশা

ছুরপির মালা পরে পাহাড় সেজেছে

মেষপালকের দল তৃণভূমি ছেড়ে যাবে এই শীতে
টুপি খুলে কাউবয় স্যালুট জানায়
ও আকাশ, তোমাকেই

আর খুব শীত করে আর শুধু শীত করে...

শীতের ভেতর থেকে হঠাৎই
একটি ইঞ্জিন এসে দম ছাড়ে তোমার উঠোনে

সঞ্জয় ঘোষ
ঠান্ডা মাংস

কিন্তু, মান্টো, তুমি এই হ্যালোইন অন্ধকার সরিয়ে নাও
অথবা তোমার একান্ত কালো দিনটার যে অভিশাপ
এ তল্লাটে ভাসিয়ে রেখে গেছ–
তাকে নির্বিরোধী অবস্থান থেকে সরে আসতে বলো।

তুমি জানো, কার কারবারে বসেছে আত্মার এই কালোজাদুঘর,
কেনো, কবরের প্রয়োজনীয় বাক্যালাপের খবরকে টুইস্ট করা হয়েছে।
বিস্মৃতির বারুদ মাথায় নিয়ে আমরা যেদিন এই ম্যাচবাক্সের বাসিন্দা হলাম,
সেদিন থেকেই দেখলাম আমাদের থেকেও আগুনের জন্ম হয়, কিন্তু
আমরা তা জ্বালাতে পারি না।
আমরা জানলাম, জীবিত কিংবা মরে তরকারি–
যেকোনো অবস্থাতেই মাংস গরম থাকা চাই।

'দেশ স্বাধীন হবে, কিন্তু মানুষ রয়ে যাবে পালিত পশু
যে সমাজ নিজেই উলঙ্গ, আমি কে তার কাপড় সরাতে যাবো!'
–সাদত হাসান মান্টো

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

নাকফুল

সকালের সৌরভ, দুপুরের সুবাস, সন্ধ্যার গন্ধ, রাত্রির ঘ্রাণে
বর্ণমালার মতো ফুটে আছে বিবিধ রঙের বীথি।

অর্কিড শিউলি এখন আর আমাকে চিনবে না,
চন্দ্রপ্রভাও ভুলে গেছে চন্দ্রমল্লিকাদের জোছনা জড়ানো গল্প।

লাল জবার লাল জিহ্বা
সাদা জবার সাদামাটা জীবন বাতাসে দোলে, বাতাসে ঝোলে।

অ্যারোমেটিক জুঁইয়ের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অভিমানে কি
করবীর সাথে অভিনয় করে নারীফুল?

জলপদ্ম থেকে কতটা দূরত্বে মাধবীলতা ঝুলে থাকে জলের দিকে
কাটামুকুটের দুঃখ-বেদনা বোঝে না প্রতিবেশি দোলনচাঁপা!

ফরোমনের আকর্ষণে প্রজাপতি বাগানবিলাসে, গোলাপে গোলাপে,
রুয়েলিয়া নীলের নিচে অনাদরে বেড়ে ওঠে যত্নহীন ঘাসফুল।

তোমার কুসুম কাননে
ঝরাপাতা আর ঝরা পাঁপড়ির আড়ালে
পড়ে থাকা আমি সেই অনধিকার চর্চায় বেড়ে ওঠা নীল নাকফুল।

ফেরদৌস নাহার

পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত

তারা সংসারবিজয়ী, তারা ঘোড়সওয়ার
ছুটে-চলা দিনে বুনোপাতার ঘরে
তাদের ঘুম আসে
তারা ঘুমিয়ে পড়ে
স্বপ্নে এক এক করে গুনতে থাকে
ব্যাধি ও ব্যাধের পরিমাণ

যেখানে বাজে মধ্যরোদের অর্গান
তিহার জেল থেকে মুক্তি পাওয়া কাফেলা
চলেছে পাগলা গারদের দিকে
টুং টাং ঘণ্টারা ঢং ঢং বেজে ওঠে
জগৎসংসার খানখান হয়ে যায়

কালো চশমা চোখে সক্রেটিস ঘুরে মরেন
অ্যাথেন্সের বাজারে

হোসেন দেলওয়ার

রেবেকার অশ্রু

নীল ময়ূরের ডাকে মধ্যরাতে ঘুমন্ত শহর জেগে ওঠে

এই তো হাঁটছি, ম্লান জোছনার আলো
যতোদূরে চোখ যায়
অলস রাতের ঢেউ তীরে ফেরার আগেই জলে ভেঙে যায়

কখনো ভালোবাসোনি জানি
তবু নিয়োলিথ জলে যতো পাতা ঝরে
আমি তাকে নীল ময়ূরের অলস পেখম মনে করি
রেবেকার অশ্রু মনে করি

অরূপ কিষান

পাগলবুঝ

ওই মুখের টেরাকোটায় বুঝে নিই ব্রেইল-ভাষা, চোখ-বেঁধে যেহেতু নিয়ে গেছ আমায় তোমার আস্তানায়; চুম্বনকালে মুখের ভেতর ঠেসে থাকে মেঘ–এও হবে কোনো ব্রেইল-কৌশল

ধরো যদি উঁচু করে আলোতে–কার্বন পেপারে চুপ করে আছে সব

রূপকের বিড়াল হাঁটল তোমার পায়ে পায়ে,
আশকারা পেলে দেখাত সে ফসফরাস

আগুন-লাগা বিমানের ন্যায় ধোঁয়ার সন্তাপে নিজের গা নিজে ধরি প্যাঁচিয়ে; বিশেষ কেউ খোয়া গেলে চাঁদের গাঁয়ে মানুষ তাকে খুঁজতে থাকে; ক্ষতিপূরণ নয় পাগলবুঝ হিসেবে চাঁদের আছে অনেক খ্যাতি

শিমুল সালাহ্উদ্দিন

আঁধারযাত্রা

অন্ধকারে
যায় কি গো আর
হাঁটা?
তোমার দিকের রাস্তা আমার কাটা।

জোয়ার জলে আসেই যদি ভাটা
আঁকড়ে থেকো শক্ত মাটির গা টা
অন্ধকারে যায় কি গো আর হাঁটা!

আদর যতো বাদরপনা ছিলো
সুড়সুড়িময় দুপুর রাত্রিবেলা
কান্নানলা চোখের জলের ঝিলও
শুকিয়ে কাঠ, সব নিয়তি আঁটা?
অন্ধকারে যায় কি গো আর হাঁটা!

প্রেমে এমন শর্ত কেন থাকে
কাছে তাকে পেতেই হবে পুরো!
কোথায় যে কে স্বপ্নমিতি আঁকে
জোয়ার শেষে আসে নিঠুর ভাটা
অন্ধকারে যায় কি গো আর হাঁটা!

তোমার দিকের রাস্তা আমার
কাটা।

শিশির আজম

দালির গোঁফ

স্যুরিয়ালিস্ট দালির ছিল বিস্ময়কর গোঁফ
যার দুটো প্রান্ত ষাঁড়ের শিঙের মতো বাঁকানো
হ্যাঁ, ষাঁড়টা নির্ঘাত কাতালান
আর ওর মারাত্মক শিংদুটো তটস্থ করে তুলেছিল প্যারিসকে

আচ্ছা এমন কাউকে কি আমরা পাব না আজও
যে কেটে ফেলতে পারে দালির ঐ গোঁফ
আর আমাদের স্বস্তি দিতে পারে

আনুশকা যশরাজ

অনূদিত ছোটগল্প

অঙ্কন-শিক্ষা

আনুশকা যশরাজ

ভাষান্তর : মুহসীন মোসাদ্দেক

[আনুশকা যশরাজ ভারতের মুম্বাইয়ে বেড়ে উঠেছেন। তিনি নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে ফিল্ম প্রোডাকশনে ব্যাচেলর অব ফাইন আর্ট এবং অস্টিন-টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ রাইটার্স প্রজেক্ট থেকে ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ে মাস্টার অব ফাইন আর্ট সম্পন্ন করেন। তিনি ম্যাসাচুসেটসের প্রভিন্সটাউনের ফাইন আর্ট ওয়ার্ক সেন্টারে ২০১৫-১৬ এর একজন ফেলো ছিলেন এবং বর্তমানে অস্টিনে বসবাস করছেন। তিনি ২০১২ এবং ২০১৭ সালে এশিয়া অঞ্চলের ক্যাটাগরিতে কমনওয়েলথ ছোটগল্প পুরস্কারের আঞ্চলিক বিজয়ী হয়েছিলেন। তার লেখা 'গ্রান্টা' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। প্রিন্সিপলস অব প্রেডিকশন তার প্রথম বই। অনূদিত গল্পটি ২০১৭ সালে এশিয়া আঞ্চলের ক্যাটাগরিতে কমনওয়েলথ ছোটগল্প পুরস্কারের আঞ্চলিক বিজয়ী হয়। 'গ্রান্টা' ম্যাগাজিন থেকে নিয়ে এই অনুবাদ করা হয়েছে।]

আমার স্বামীর বাম চোখের পাতায় একটি তিল আছে যা দেখতে ধূসর কাজলের মতো। শরীরের অংশের ওপর নির্ভর করে তিল বিভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে। আমার নাভির উপরে একটি আছে এবং আমি জানতাম এটি উর্বর প্রজনন ক্ষমতার লক্ষণ, কিন্তু তা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমার জ্যোতিষী নায়ার সাহেব আমাকে জানিয়েছেন চোখের ওপর বা চারপাশে তিল থাকলে পারিবারিক ঝামেলা বা আর্থিক দুর্ভোগ হতে পারে। তিনি আমার স্বামীর তিলের একটি ছবি চান, কারণ আমার স্বামী সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকায় পরামর্শের জন্য আমার সাথে যেতে পারেনি।

জ্যোতিষী চান যে আমি ছবি আনতে বাড়ি ফিরে যাই, কিন্তু বাড়ির বাইরে বের হলে যে পরিমাণ শক্তির মজুদ লাগে তা সঞ্চয় করতে আমাকে বেশ সংগ্রাম করতে হয়। এমনকি নায়ার সাহেবের ডেসটিনি বাজারে এই সামান্য ভ্রমণ–আমার বাড়ি থেকে দশ মিনিটের ট্যাক্সি এবং পাঁচটি সিঁড়ির দূরত্ব–আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। আমি তার কাছে একটা কাগজ এবং পেন্সিল চাই; এবং স্মৃতি থেকে আমার স্বামীর চোখের একটি ছবি আঁকি। আমি ফ্লোরা নামের একজন মহিলার কাছ থেকে অঙ্কন শিখছি। তিনি প্রতি সোমবার এবং বুধবার আমার বাড়িতে আসেন এবং গত পাঁচ সপ্তাহ ধরে আমরা বাটিভর্তি ফল আঁকছি: আম, আপেল, নারিকেল, লিচু। আমি আশা করি, শিগগিরি তিনি আমাকে মানব-গঠন আঁকতে শেখাবেন।

নায়ার সাহেব আমার অঙ্কনের ওপর তার আঙুল বোলালেন, যেন কাগজের জমিন কিছু প্রকাশ করতে পারে। তিনি তার দুই হাতের বুড়ো আঙুলে বড় সোনার আংটি পরেন এবং তার নখগুলোতে সাম্প্রতিক ম্যানিকিউরের মতো উজ্জ্বলতা রয়েছে। যখন তিনি মুখ এবং শনি গ্রহের মধ্যে সংযোগ সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেন, তখন আমার চোখ বিপরীত দেয়ালে একটি চিত্রকর্মের দিকে আটকে যায়। একটি ব্রোঞ্জ ফ্রেমের মাঝখানে হলুদ এবং কমলা রঙের দাগ দ্বারা বেষ্টিত হীরা আকৃতির গঠন যা সবুজাভ ও ফিরোজা রঙের মিশ্রণে অলঙ্কৃত।

রঙগুলো দৃষ্টিতে আঘাত করে, মনে মনে ভাবি এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে জোরে বলে ফেলি।

নায়ার সাহেব আমার দিকে তাকান, তোমার চশমা হারিয়েছে?

গার্ট্রুড স্টেইন, আমি বিড়বিড় করে বলি। হঠাৎ কথোপকথনটি একটি শব্দজব্দ ধাঁধার মতো অনুভূত হয় যেখানে সূত্রগুলো ভুল সংখ্যায় চিহ্নিত। আমি তাকে পাঁচশত টাকা দিলাম এবং আমাকে কী কী আচার-অনুষ্ঠান করতে হবে সে বিষয়ে তিনি যে তালিকা করেছিলেন তা না নিয়েই চলে আসি।

আমি সেন্ট জেভিয়ার কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করেছি এবং প্রেম করে বিয়ে করেছি, যার অর্থ জ্যোতিষীদের শরণাপন্ন হওয়া এমন কিছু নয় যা আমি সবসময় করি। প্যাসকেলের বাজি, আমি আমার বোনকে বলি, যখন সে দ্বিমত প্রকাশ করে। সে প্রতিদিন বিকেল চারটায় ফোন করে এবং আমরা এক ঘণ্টা কথা বলি। তারপরে আমি রান্নাঘরে এক ঘণ্টা কাটাই, কাজের মেয়েটি যখন আমাদের রাতের খাবার প্রস্তুত করে তখন তার সাথে কাজে হাত লাগাই এবং তদারকি করি। সরিষা পাতা, পালং শাক এবং মুলা পাতা, রসুন এবং কাঁচা মরিচ দিয়ে ভাজা–এসব কাজ এগিয়ে দিই। আমি একাই এসব সামলে নিতে পারি, সে মারাঠি ভাষায় বলে, তুমি তোমার আঁকার অনুশীলন করো গিয়ে।

আজ সোমবার। আমি প্রত্যাশা নিয়ে ফ্লোরার জন্য অপেক্ষা করছি। বাকি দিনটা নিষ্প্রভ, বিরক্তিকর এবং অনুভূতিহীন কেটেছে। পোমেরানিয়ান, যাকে আমরা ইগর নাম দিয়েছি, ডোরবেল বাজানোর আগেই ঘেউ ঘেউ করে ফ্লোরার আগমনের ঘোষণা দেয়। আমি যখন দরজা খুলি তখন ইগর ঘেউ ঘেউ করা বন্ধ করে দেয় এবং ফ্লোরার ছোট পায়ের চারপাশে শুঁকতে থাকে যখন তিনি তার নীল চপ্পল খুলে রাখেন।

স্কুলের বাচ্চারা যে ধরনের ব্যাগ বহন করে সে রকম ব্যাগে করে তিনি একটি বড় স্কেচবুক এবং কাঠপেন্সিলের একটি বাক্স নিয়ে আসেন। বেশ যত্নে বিনুনি করা রুপালি চুলের পাশে তার কাঁধজুড়ে ঝুলে থাকা ব্যাগটাকে মোটেই মানানসই লাগে না। তারচেয়ে বেমানান লাগে সন্তান-সন্ততিহীন এ বাড়িতে যখন তিনি তার পাশে মেঝেতে ব্যাগটা রাখেন।

আমরা ডাইনিং টেবিলে একে অপরের পাশে বসি এবং তাকে বলি যে আমি পোর্ট্রেট আঁকার চেষ্টা করতে চাই। আমার নিজের আগ্রহ দেখে তাকে সন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। প্রথমে সহজ কিছু, তিনি বললেন। তিনি আমার কাগজের শিটে একটি ডিম্বাকৃতির স্কেচ করেন এবং আমাকে একটি মুখের মৌলিক আকৃতি দেখান। আমাকে আঁকার চেষ্টা করুন, তিনি বললেন। কোনো একটা অংশে আটকে যাবেন না। আপনার হাত আলগা রাখুন। আর পাতার দিকে বেশি তাকাবেন না।

আমরা আমাদের চেয়ার ঘুরিয়ে বসি যাতে একে অপরের মুখোমুখি হতে পারি এবং তিনি আমার দিকে উৎসাহ ও আস্থার মিশ্রিত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তাকান। তিনি আমার অনভিজ্ঞ হাতের নিষ্ঠুরতার কাছে নিজেকে নিবেদন করেছেন। আমি মুখ দিয়ে শুরু করি : তার ঠোঁট পাতলা। তার চোখের চারপাশে ভাঁজ পড়ে গেছে। আমি বিরতি দিই এবং তিনি অঙ্কন দেখতে চান।

আপনি আমাকে তরুণ দেখাচ্ছেন, তিনি হাসেন এবং আমার গাল স্পর্শ করেন। আমার বার্ধক্য আঁকতে ভয় পাবেন না। ছায়া আঁকতে চেষ্টা করুন। পেন্সিলটি একই দিকে ঘোরান, তবে অন্ধকার প্রকাশ করতে আরও চাপ প্রয়োগ করুন।

আমি চাই তিনি আমাকে আঁকুন, কিন্তু এমন অন্তরঙ্গতায় নিজেকে জড়াতে আমি সায় দিতে পারি না। এটা যে অনুভূতি জাগাতে পারে তা নিয়ে আমি ভয় পাচ্ছি। আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করলাম কারণ আমি ক্লান্ত। তিনি অঙ্কনগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার আঁকা লাইনগুলো আমাকে কোকোশকার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ফ্লোরা তার ফোনে নামটি টাইপ করেন এবং আমাকে অস্ট্রিয়ান অভিব্যক্তিবিদ অস্কার কোকোশকার প্রতিকৃতি দেখান। আমাদের দুজনের মাথা প্রায় লাগোয়া অবস্থায়, আমরা একসঙ্গে ছবির দিকে তাকাই। আমি তার ট্যালকম পাউডারের ঘ্রাণ পাই।

যাওয়ার আগে ফ্লোরা তার পারিশ্রমিক দিতে বলে। আমি আমার চেকবুক বের করি এবং তার পুরো নাম জিজ্ঞেস করি।

ফ্লোরা ভা-ব-না-নি।

সিন্ধি?

তিনি মাথা ঝাঁকালেন।

আমি বলি, ফ্লোরা তো একটি ক্যাথলিক নাম।

তিনি কাঁধ ঝাঁকান, তারপর হাসেন। আমার শুধু জন্মটাই চেম্বুরে, ১৯৫০ সালে যখন সেখানে একটি শরণার্থী শিবির ছিল। তারপর থেকে আমি এখানে বসবাস করছি।

আমি জানতে চাই তার কোনো সন্তান আছে কিনা।

একটা মেয়ে। কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়েছে। তিনি বিস্তারিত বলেন না এবং তার আচরণে কিছুটা দৃঢ়তা দেখা যায়। এক মুহূর্তের জন্য আমি আরেকজন ফ্লোরার আভাস পাই : একজন মহিলা যিনি মাতৃত্বের চেষ্টা করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন।

আমি আবার গার্ট্রুড স্টেইনের কথা ভাবছি এবং কীভাবে করুণ আমাকে মুগ্ধ করার জন্য তার বই থেকে বাক্যগুলো মুখস্থ করেছিল। সে কল করে এবং আমি ফোন ধরি না কারণ আমি ইতিমধ্যে জানি যে সে রাতের খাবারের জন্য বাড়িতে আসবে না। আমার ফোন কম্পনের মাধ্যমে জানান দেয় একটি টেক্সট ম্যাসেজ এসেছে: কেন ফোন ধরছ না? সহকর্মীদের সাথে ড্রিংক করছি। দেরি হবে। ভালোবাসা।

আমাদের দুজনের এক কমন বন্ধুর আয়োজিত একটি পার্টিতে করুণের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। কোনো কারণে আমাদের মিলিত করাই ছিল বন্ধুটির অভিপ্রায়। কিন্তু এখনও আমার অজানা কারণগুলো কী ছিল। বন্ধুটি পরে দাবি করেছিল যে তার একটি অন্তর্দৃষ্টি তাকে ইঙ্গিত দিয়েছিল যে করুণ এবং আমি একটি আলকেমিক্যাল ম্যাচ হবো।

এর মানে কী? আমি একবার জানতে চেয়েছিলাম, এই সন্দেহে যে আমাদের সামাজিক নীরিক্ষা হিসেবে একসাথে ঠেলে দেয়া হয়েছিল কিনা। আমি শুধু বলতে পারি যে কিছু রূপান্তর ঘটবে, সে বলেছিল।

করুণ আর্কিটেক্ট হওয়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল, আর আমি স্নাতকপড়ুয়া এক ছাত্রী ছিলাম যার নোটবুক ভরা থাকত দুর্বল কবিতায়। সে ধূমপান

করত এবং আমি এর গন্ধই পছন্দ করি না। আমার পারফিউম তার হাঁচির কারণ হতো এবং আমি তার রসিকতা বুঝতে পারতাম না। আমি তখন যে মানুষটা ছিলাম, এখন আমার কাছে সে একজন অপরিচিত, আমরা একসাথে বিছানায় যাওয়ার আগে কয়েকটি ডেটিংয়ে রাজি হয়েছিলাম। আমাকে যা তার দিকে টেনে নিয়ে যায় তা হলো তার চারপাশের সবকিছুর প্রতি তার মনোযোগ। আমি যখন তার সাথে থাকতাম তখন পুরো পৃথিবী আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে যেত। সে সবসময় এই জিনিসগুলো তুলে ধরতো: একটি অদ্ভুত চেহারার পাখি, একটি অবাস্তব রাস্তার চিহ্ন, একজন ব্যক্তি ঘুড়ি এবং বাঁশি বিক্রি করে, একটি বিল্ডিংয়ের সৌন্দর্য যার পাশ দিয়ে আমি প্রতিদিন যাই। বিয়ের এক বছর পরে আমি বুঝতে পারলাম করুণের বাহ্যিক চেহারাও একটা ফাঁকি ছিল: সে আমার কাছ থেকে যা লুকিয়েছিল।

করুণ যখন বিছানায় শুতে আসে তখন ভোর পাঁচটা বাজে। যদি আমি জিজ্ঞেস করি, সে বলবে: আমি একটার সময় বাড়িতে এসেছি কিন্তু এতক্ষণ বসার ঘরে টেলিভিশন দেখছিলাম। আমি জানি এটা সত্য নয়, কারণ আমি ভোর চারটা পর্যন্ত বসার ঘরে ছিলাম এবং খবরের পুনঃপ্রচার দেখছিলাম।

প্রশ্নটির যে উত্তর আমি জানি সেটিও অভিযোগকে আশ্রয় করে এমন একটি প্রশ্ন। আমি আমার মাথার ভেতরে ভাবনাগুলোর সাথে লড়াই করি। বুঝতে পারি যে, সান্ত্বনামূলক কিছু একটা দিয়েই এটা থেমে যাবে। আমাদের মধ্যে তাই কোনো বাক্য বিনিময় হয় না, আমি কোনো প্রশ্ন করি না। পরিবর্তে, আমি সকালে নাস্তার সময় নিজেকে করুণের সাথে সুন্দর আচরণ করতে দেখি–তার ঘাড়ে একটি চুম্বন করি, যার প্রতিদান সে দেয় না। এভাবে আমাদের বিয়েটা দুটি আলাদা বিয়েতে ভাগ হয়ে যায়। একটি যা আমার মাথার ভেতরে শব্দ ও আবেগে ভরা এবং অন্যটি যা আমি করুণের উপস্থিতিতে মুখোমুখি হই।

শৈশবে, আমি যে কোনো ধরনের সংঘর্ষ বা বিরোধে ভয় পেতাম এবং জাতীয় সঙ্গীত আবৃত্তি শুরু করতাম যখন কেউ আমাকে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত যা আমার কাছে ব্যঙ্গাত্মক বা পীড়াদায়ক মনে হতো। এই অভ্যাসটি আমাকে ভিন্ন ধরনের এক ঝামেলায় ফেলেছিল যখন আমি তেরো বছর বয়সি: আমাকে স্কুলের মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তিনি আমাকে হ্যাঁ বা না দিয়েই উত্তর দেয়া যায় এমন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, যার কারণে আমি সম্ভবত উত্তর দিয়ে যেতে থাকি এবং এরপরে আমাকে জাতীয় সঙ্গীত আবৃত্তি করা বন্ধ করতে বলেছিলেন যা আমি প্রত্যাশা করিনি।

আমার বোন যখন আমাদের নির্দিষ্ট সময়ে ফোন করে, আমি তাকে বুঝিয়ে বলি যে আমি একজনের সাথে দুটি বিয়ে করেছি।

সোনা, তোমাকে স্কিজয়েড বলে মনে হচ্ছে, সে বলল।

আমি কথা ঘুরিয়ে ফেলি এবং তার ছেলের ব্যাপারে জানতে চাই। ছেলেটি উত্তর আমেরিকার একটি ছোটখাটো লিবারেল আর্ট কলেজে পড়ে এবং কিছুদিন আগে মাদক রাখার দায়ে গ্রেফতার হয়েছিল। সে সাধারণত আকাশের ব্যাপারে বলতে গেলে বেশ আক্রমণাত্মক সুরে কথা বলে, কিন্তু আজ তাকে ক্লান্ত মনে হলো। আমরা একজন ভালো আইনজীবী ঠিক করেছি, সে বলে। তবে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হতে পারে।

সে ফিরে এলে তো বেশ ভালোই হয়, আমি বলি।

আমি জানি যে এটা তোমাকে খুশি করে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। একটাই ছেলে তাকেও আমি দেখে রাখতে পারিনি।

তুমি জানো এটা সত্য নয়, তারিনী। অন্তত তোমার একটা ছেলে আছে। সেদিন রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। আমি টেলিফোনে একটি শিশুর সাথে কথা বলছি। এটি একটি পুরনো রোটারি ফোন ছিল। শিশুটি কাঁদছিল এবং আমার বাড়ির ঠিকানার দিকনির্দেশনা চেয়েছিল, কারণ সে হারিয়ে গেছে। আমি তাকে দিকনির্দেশনা দিতে পারিনি, কারণ সে জানে না সে কোথায় ছিল। আমি তাকে একের পর এক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকি, কিন্তু তা তাকে আরও কাঁদিয়েছিল। খুব কষ্টদায়ক ছিল স্বপ্নটা।

তুমি কি এখনো ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ড বিবেচনা করছ না?

না, আমি জানি না। করুণ খরচ নিয়ে চিন্তিত। আর দয়া করে আমাকে তোমার কাছ থেকে টাকা নেয়ার প্রস্তাব দিবে না। এ নিয়ে আর তর্ক করতে চাই না।

তারিনী কথা বাড়ায় না। আমরা দুজনেই আমাদের নৈমিত্তিক সংগ্রামে খুব ক্লান্ত। সে আমাকে নতুন একটি টেলিভিশন শো সম্পর্কে বলে যা তার স্বামী তাকে দেখতে বাধ্য করে। এটি হনুমানের পৌরাণিক কাহিনির উপর ভিত্তি করে বানানো এবং সকল হিন্দু দেবতার আধুনিক সব সুপারপাওয়ার রয়েছে। যত্তসব বিরক্তিকর। আমি মনে করি সে দ্বিতীয় সন্তান পেতে চায় যাতে এই কার্টুনগুলো দেখতে পারে। আমাকে এখন যেতে হবে, সে বলে। আমি একটি ক্যাসেরোল তৈরি করছি।

আমি সবসময় আমার বোনের নাম নিয়ে ঈর্ষান্বিত ছিলাম এবং কখনো বুঝতে পারিনি কেন আমার বাবা-মা তাকে মিষ্টি, সাধারণ, ভারতীয় নাম দিয়েছিলেন, যেখানে আমাকে ময়রা নামে ডাকা হতো। আমি জানতে চাইলে আমার মা আমাকে বলেছিলেন, নামটি একটি বই থেকে নেয়া।

কী বই?

আমি ঠিক জানি না। ভালো একটি বই। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করো।

আমার আসলে মনে নেই, বাবা বলেছিলেন।

এটা আমাকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল যে আমার অনুভূতির অসম্পূর্ণতার জন্য অন্য কারও অকেজো স্মৃতি দায়ী। কিন্তু এখন আমি জানি: ময়রা মানে ভাগ্য।

সোমবার, ফ্লোরা অন্যদিনের চেয়ে বেশ আগেই চলে আসে এবং জানতে চায়, অঙ্কন শুরু করার আগে আমি হাঁটতে যেতে চাই কিনা। পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার গরম এবং বাইরে মেঘহীন পরিষ্কার আকাশ, কিন্তু আমি উত্তর দেয়ার আগেই সে স্বীকার করে: আপনার স্বামী গতকাল আমাকে ফোন করেছিলেন, কারণ তিনি আপনার জন্য চিন্তিত এবং তিনি আমাকে বলেছেন আপনাকে নিয়ে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে। তিনি বলছিলেন যে, আমরা অঙ্কন ক্লাস শুরু করার পর থেকে আপনি আরও প্রফুল্ল বোধ করছেন। তিনি মনে করেন আমি ভালো প্রভাব তৈরি করতে পারি। আমি দুঃখিত, তিনি আমাকে এসব আপনাকে বলতে মানা করেছিলেন। তিনি বেশ উদ্বিগ্ন, তবে আপনাকে এটি না বলে গোপন রাখা উচিত মনে হয়নি আমার।

আমার গলা ধরে আসে এবং আমি ব্যথিত বোধ করি। এক মুহূর্তের জন্য আমার চিন্তাভাবনা বিচ্যুত হয়ে যায় এবং আমি আমার ঘাড়ে একটি হাত রেখে তাকে বলি, আজ খুব গরম কিনা। আমি কি ফ্যান চালু করব?

আপনি কি আমার ওপর মর্মাহত? তিনি অপ্রত্যাশিত নরম স্বরে জানতে চাইলেন। আজ খুব গরম একটা দিন। আমাদের হাঁটতে যেতে হবে না। দেখুন। তিনি আমার হাতের কবজির কাছে ধরে তার বুকের বামপাশে আমার হাতটা চেপে ধরেন, তারপর তিনি আমার হাতটা তার বুকের ডানপাশে রাখেন। কিছু কি অন্যরকম লাগছে, তিনি বলেন। আমি স্তব্ধ হয়ে যাই, কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি না। কিন্তু তার অঙ্গভঙ্গি যৌন আবেদনময় নয়।

এগুলো অন্যরকম লাগছে, তোতাপাখির মতো তার কথা এবং গলার স্বর অনুকরণ করে বলি আমি।

তিনি আমাকে তার স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে এবং কীভাবে তার বাম স্তন মাস্টেক্টমির মাধ্যমে সম্পূর্ণ অপসারণ করা হয়েছিল তা বলেন। আমার এই বয়সে এটি পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কখনো কখনো আপনি একটি যৌন অঙ্গ হিসেবে এটা দেখা প্রায় মিস করবেন। আমি আপনাকে এসব কেন বলছি? আমি জানি আপনি এবং আপনার স্বামী একটি সন্তানের জন্য চেষ্টা করছেন। আমি জানি, নিজের শরীরের বিশ্বাসঘাতকতার অনুভূতি কেমন লাগে।

আপনি আমার অবস্থা জানেন না, আমি বলি, নিজের কণ্ঠের শীতলতায় নিজেই বিস্মিত হয়ে যাই।

ফ্লোরা কিছুক্ষণের জন্য কিছু বলেন না, তবে টেবিলে অঙ্কন সামগ্রী সাজিয়ে রাখেন এবং রঙতত্ত্ব ও আভা নিয়ে কথা বলেন। অবজেক্টকেই

আমার বোন সন্ধ্যায় যখন ফোন করে, আমি এসবের কিছু তাকে বলি না। এটা নয় যে তারিনী সমকামবিরোধী, কিন্তু এই বয়সে এসে আমার যৌনতার নতুন রূপ আবিষ্কার করে আমি বেশ বিব্রতবোধ করছি। আমি ইতিমধ্যেই তার প্রতিক্রিয়া ধারণা করতে পারি: তোমার সংসার ভাঙার পরিবর্তে সন্তান ধারণের দিকে মনোনিবেশ করো, কুণ্ঠাহীন বিরস কণ্ঠে সে বলবে।

বলতে দিন এটি কী রঙ হতে চায়, তিনি বলেন। আমরা নীরবে কাজ করি, একটি ছোট তামার মগে জলরঙের পেইন্টিং তৈরি করি।

গ্যেটে: অসুস্থ ব্যক্তিরা প্রায়শই বিভিন্ন রঙের বস্তু দেখতে পান। বয়েল একজন মহিলার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, পড়ে গিয়ে যার একটি চোখ থেঁতলে গিয়েছিল, তিনি সমস্ত বস্তু দেখেছিলেন, তবে বিশেষত সাদা বস্তুগুলো, রঙে চিকচিক করছে, এমনকি তা অসহনীয় মাত্রায়।

রাতের খাবারের সময়, করুণ জানতে চাইল আমার দিন কেমন গেল, কিন্তু আমি ফ্লোরার কথা বলি না, বা বুঝতে দিই না যে সে আমার অবস্থা সম্পর্কে তার সাথে কথা বলেছে সেটা আমি জানি। সে আমাকে একজন নতুন ক্লায়েন্ট সম্পর্কে বলে যিনি কয়েকদিন পর পরই মিটিংয়ের জন্য ডাকেন কারণ তিনি বাড়ির নকশা সম্পর্কে তার মন পরিবর্তন করে চলেছেন। একদিন তিনি সব কিছু কাঠ এবং বাঁশের তৈরি চান, তারপরের দিন তিনি কিছু সিনেমা দেখে চান যে সব মার্বেলের হোক। সুতরাং, কাল আবারও রাত হয়ে যাবে ফিরতে।

ঠিক আছে, আমি বলি। ভাবছিলাম কাল বান্ধবীদের সাথে ডিনারে যাব। নতুন চাইনিজ রেস্টুরেন্টটা ট্রাই করতে চায় টিনা।

বেশ ভালো, ডাক্তার এক্স-রে পরীক্ষা করার সময় যেভাবে তাকায় তেমন করে তাকিয়ে সে বলল।

ওরা আমার কলেজের বন্ধু: টিনা, উর্মিলা এবং যোগিতা। আমি কয়েক মাস ধরে তাদের কারও সাথে কথা বলিনি, এবং আমার তা করার কোনো ইচ্ছেও নেই। টিনা তার দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে চলেছে, উর্মিলার প্রথম মেয়ে সম্প্রতি স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে এবং যোগিতার সন্তানের সংখ্যা আমি ভুলে গেছি।

তারা আমার স্বপ্নে উপস্থিত হয়, যেহেতু আমি মিথ্যা বলেছি এবং তাদের আমার অনভিপ্রেত সহযোগী বানিয়েছি। টিনা আমাকে বলতে থাকে তার মূত্রাশয় ফেটে যেতে চায় এবং বাকি দুজন আমার স্তন চেপে ধরেছে। তারা মনে করে একজন দুগ্ধ মা হিসেবে আমার ভালো কর্মজীবন হবে। তারা চলে যায় এবং ফ্লোরা আসেন। তিনি পোশাক খুলে দেন কারণ তিনি আমাকে তাকে আঁকতে দিতে রাজি হয়েছেন, কিন্তু আমি লালসায় কাবু হয়ে যাই এবং জিজ্ঞেস করি আমি তাকে চুমু দিতে পারি কিনা। আমি আমার হাত তার শরীরে বোলাতে থাকি এবং বলি আমি তাকে কমলা এবং সোনা রঙে আঁকতে চাই। আমি তার ঘাড়ে চুমু খেলাম এবং তার ধড়ের বাম পাশের দাগটি চাটলাম। অ্যামাজনের মহিলারা তাদের স্তন কেটে ফেলে যাতে তারা আরও ভালো যোদ্ধা হতে পারে, তিনি আমাকে বলেন এবং হঠাৎ আমি ভয় পাই: তাকে নয়, তার প্রতি আমার কামাসক্তিকে।

আমি ফ্লোরাকে একটি চিরকুট লিখি। লেখার জন্য সঠিক শব্দ বেছে নেয়ার চেষ্টা করে এক ঘণ্টা ব্যয় করি। আমি কি অঙ্কন চালিয়ে যেতে পারছি না, নাকি আমার আর সেগুলোর প্রয়োজন নেই? আমি কি তাকে আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা পাঠাব নাকি আমার বিনীত শুভেচ্ছা? শেষ পর্যন্ত লিখেছি যে, আমি আমার অঙ্কন-শিক্ষার ইতি টানছি কারণ আমি আমার জীবনের অন্যান্য বিষয়ে আরও বেশি সময় বিনিয়োগ করতে চাই। আমি ফ্লোরার বাড়িতে চিরকুটটা পৌঁছে দিতে কাজের মেয়েকে পাঠাই এবং সাথে কিছু টাকাও দিই। কাজের মেয়ে চিরকুটটা দিতে চলে যাওয়ার পর, সবচেয়ে নির্লজ্জ মিথ্যা বেছে নেয়ার জন্য আমি নিজেকে তিরস্কার করি। আমি নিশ্চিত নই যে, এটা নিষ্ঠুরতার নজির, নাকি সাহায্যের জন্য আর্তনাদ।

খাদ্য কীভাবে থাইরয়েড এবং ফার্টিলিটিকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কিত একটি বই পড়ার চেষ্টা করি, কিন্তু আমার মনের ভেতর বিভিন্ন ভাবনা ঘুরপাক খেতে থাকে এবং আমি উড ইউ র‍্যাদার খেলাটি খেলি। আমি অবশ্য সব উত্তরই জানি। আমার নিজের শরীর না আমার স্বামীর শরীর বিশ্বাসঘাতকতা করছে? কোনো উপাঙ্গ খোয়াবো নাকি আমার বিয়ের সম্পর্ক হারাবো? ভোগান্তি পোহাবো নাকি আমার আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে সত্য কথা বলব? পঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যাব নাকি কখনোই বাচ্চা প্রসবের অভিজ্ঞতা হবে না?

কাজের মেয়েটা টাকা নিয়ে ফিরে আসে। ফ্লোরা ম্যাম বললেন, দরকার নেই, ভাঙা ভাঙা ইংরেজি এবং মারাঠির মিশ্রণে কাজের মেয়ে আমাকে বলে। কাজের মেয়ে আমার হাতে টাকাটা ফিরিয়ে দেয়, সাথে একটা বই, যা ফ্লোরা আমার জন্য পাঠিয়েছেন। গ্যেটের লেখা ডকট্রিন অব কালারস। আমি বইয়ের পাতা উল্টে পাল্টে দেখতে থাকি, আর খুঁজতে থাকি কোনো চিরকুট আছে কিনা, বা কোথাও আন্ডারলাইন করা কোনো বাক্য, কিংবা কোণা ভাঁজ করা কোনো পৃষ্ঠা, কিন্তু তার কাছ থেকে কোনো বার্তার চিহ্ন পাওয়া গেল না।

আমার বোন সন্ধ্যায় যখন ফোন করে, আমি এসবের কিছু তাকে বলি না। এটা নয় যে তারিনী সমকামবিরোধী, কিন্তু এই বয়সে এসে আমার যৌনতার নতুন রূপ আবিষ্কার করে আমি বেশ বিব্রতবোধ করছি। আমি ইতিমধ্যেই তার প্রতিক্রিয়া ধারণা করতে পারি: তোমার সংসার ভাঙার পরিবর্তে সন্তান ধারণের দিকে মনোনিবেশ করো, কুণ্ঠাহীন বিরস কণ্ঠে সে বলবে।

দিনগুলো ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে, কোনো কিছুর অপেক্ষা নেই। আমি জ্যোতিষীর সাথে দেখা করি, কিন্তু তার কাছে বলার মতো নতুন কিছু নেই। দুই সপ্তাহ আগের দিনগুলো যেমন কেটেছে সামনের দিনগুলো তেমনই দেখায়। আমি ফ্লোরার দেয়া বইটা পড়ে শেষ করি এবং একদিন সন্ধ্যায় তাকে ফোন করি, আশা করি তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

ক্ষমা করার কী আছে, তিনি অস্ফুট স্বরে বলেন, যদিও আমি তার কথা বিশ্বাস করি না।

আমরা কি আগামী সপ্তাহ থেকে ক্লাস শুরু করতে পারি?

কেন নয়, তিনি বলেন।

এটা জুন মাস এবং বৃষ্টির সময় এসে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করি যে, তিনি আমাদের ক্লাসের পরে হাঁটতে যেতে চান কিনা।

কেন নয়, তিনি আগের কথার পুনরাবৃত্তি করেন।

আমি বই থেকে তাকে পড়ে শোনাই। রঙ এবং তাদের ছায়া সম্পর্কিত একটি অধ্যায়ের একটি অনুচ্ছেদ।

হ্যাঁ, তিনি বলেন। এমনকি আমরা ছাদবাগানে গিয়ে ফুল তুলতে পারি।

আমি চোখ দুটো বন্ধ করি এবং আমার স্বপ্নে তার একটি প্রতিমূর্তি ফুটে ওঠে। গ্যেটে এসবকে বলেন, রেটিনার বিস্ময়কর অনুরাগ।

মুহসীন মোসাদ্দেক ॥ অনুবাদক

সন্‌জীদা খাতুন

জন্মদিন

সন্‌জীদা খাতুন

নবতিবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

রূপকথা

জীবনের চেয়ে বড়ো রূপকথা আর হয় না, বলেছিলেন রূপকথাকার হ্যানস এন্ডারসন। ঐ যে মাদুরের ওপর বসে হারমোনিয়াম নিয়ে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে একের পর এক গান গেয়ে চলেছে চৌদ্দ-পনেরো বছরের কিশোরী, তার পাশেই একটি বিশেষ গান তাঁর চেয়ে দশবছরের বড়ো দিদির কাছে আবদার করেও শুনতে পাচ্ছে না, প্রতিবাদস্বরূপ মাদুরে গড়াগড়ি, দিদির দিকে তির্যক চোখে চাওয়া, এসবের ফলে দিদির বাধ্য হয়েই পাঁচ বছরের ছোট্ট বোনটির মনোরঞ্জনার্থে শোনাতেই হয় গানটি, 'তৃষ্ণার জল এসো হে'। ঐটুকু মেয়ে, কী বোঝে গানটির? তবু ভালো লাগে। শুনতে ইচ্ছে করে। একবার। দুবার। বারবার। তাই তো মাদুরে হারমোনিয়ামটিকে সাক্ষী রেখে সত্যাগ্রহ, অর্থাৎ গড়াগড়ি। অদ্ভুত!

বাড়িটার সবটা না হোক, অনেকটাই অদ্ভুত। পদার্থবিদ্যা আর প্লেটো। মেলানো যায়? অথবা পরিসংখ্যান আর কাজী নজরুল? শ্যামাসংগীত এবং দাবা? এ বাড়িতে মেলান একজন। ঐ যে তাঁর বেসুরো গলায় শুরু হয়ে গেল, 'বাজবে যে মহেশের বুকে, নেমে দাঁড়া ক্ষেপা মাগী।' তার খানিক পরেই 'যদি বারণ করো তবে গাহিবো না।' না, বারণ করবেন কোন দুঃখে? গায়কের স্ত্রী সাজেদা খাতুন বরং উপভোগই করেন তাঁর এই অ-সুরসাধক পতিমহাশয়কে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস উর্দুতে অনুবাদ করার একঘেয়েমি কাটে তাঁর এতে। অন্য এক ভাই আবার গজুলে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলসঙ্গীতের পাশাপাশি গজল গানও তাঁর প্রিয়।

পরিবারের সদস্যসংখ্যা? এটা ১৯৪০-৪২, সম্পূর্ণ গণনা আপাতত স্থগিত রেখে যদি আর বছর চার-পাঁচ অপেক্ষা করি তো দেখব, আরেক রূপকথায় যে 'সাত ভাই চম্পা' পেয়েছিলাম, তা পাল্টে গিয়ে হয়েছে সাত বোন। তৎসহ চার ভাই। মা। বাবা। হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয়া সনজিদা খাতুন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রূপকথার মতোই মনে হচ্ছে। অন্তিমেও দেখব, তাঁর সুদীর্ঘ নব্বই বছরের আয়ুষ্কাল, অসংখ্য কৃতি, বাংলাদেশের সারস্বত জগৎকে হিমালয়প্রতিম উচ্চে তুলে ধরা, এই বয়সে নতুন নতুন ভাবনা, রূপকথাকেও হার মানায়।

ইতিকথার আগের কথা

সন্‌জীদা খাতুন স্বনামধন্য পিতা কাজী মোতাহার হোসেনের কন্যা। মা সাজেদা খাতুন। পিতা ফরিদপুরের, মা হুগলির। পিতা ড. কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন পরিসংখ্যান ও পদার্থবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। ছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্নেহধন্য। সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশেই পদার্থবিদ্যায় এম এ মোতাহার কলকাতায় পরিসংখ্যান নিয়ে পড়তে যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগ চালু করেন। পাশাপাশি নজরুলের চেয়ে দুবছরের বড়ো হয়েও তাঁর সুহৃদ, কবি যাঁকে 'মোতিহার' ডাকতেন। তিরিশের দশকে যে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন শুরু করেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, আবুল ফজল, তাঁদের মতো তিনিও এতে অংশ নেন। এঁদের মুখপত্র 'শিখা'-তে লিখতেন। উপমহাদেশে দাবা খেলাকে জনপ্রিয় করার পুরোধা এই মানুষটির ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মুক্তমনা ও প্রগতিশীল ছিলেন বলেই তাঁর সন্তানদের অনেকেই বাংলাদেশের কিংবদন্তিতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। প্লেটোর 'SYMPOSIUM' অনুবাদ করেন তিনি। লিখেছেন গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস, নজরুলের কাব্যের আলোচনাসহ বিবিধ গ্রন্থ। স্ত্রী সাজেদা খাতুন বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি উপন্যাস উর্দুতে অনুবাদ করেন।

সন্‌জীদাকে রূপ দিয়েছে একদিকে তাঁর পরিবার, অন্যদিকে সময়। ১৯৩৩-এ জন্ম তাঁর, এক সংস্কৃতিমান পরিবারে। পিতা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। স্বভাবতই বাড়িতে একটি সারস্বত পরিবেশ ছিল। সেগুনবাগিচায় থাকতেন তাঁরা। বাড়িতে প্রায়শ গুণী মানুষদের আনাগোনা। আর নানা সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আন্দোলনে তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবন পরিব্যাপ্ত। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই যা চলমান। সন্‌জীদার চলার পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, যদি সেসময়কার যাবতীয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনি।

যখন পাকিস্তান জন্ম নেয়, সন্‌জীদা তখন চৌদ্দ বছরের। তার আগে থেকেই পাকিস্তান আন্দোলন, লাহোর প্রস্তাব, পঞ্চাশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গার কাল সময় পেরিয়েছে উপমহাদেশ। স্বাধীনতার পরপর শুরু হলো পশ্চিমাদের শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গবাসীর নতুন করে লড়াই। দশকের পর দশক বিচিত্র মাত্রায়। বাহান্নো, চুয়ান্নো, ছাপ্পান্নো। বিশদ করব না, জানা তথ্যের। গোটা ছয়ের দশকটি ছিল একাত্তরের রিহার্সাল, সবদিক থেকেই। কীরকম?

গোড়াতেই একটা বিষয় মনে রাখা জরুরি, সন্‌জীদা খাতুনের সংস্কৃতিজগতে যে মহতী ভূমিকা, তা পরম্পরাবাহিত। পিতা ও পরিবার থেকে তিনি মুক্তবুদ্ধি নিয়ে এগোবার প্রশ্রয় পান একদিকে, অন্যদিকে শিক্ষাজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীতে পাঠগ্রহণের সুযোগ তাঁর জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী যখন, সৈয়দ আলী আহসান এমনভাবে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' পড়াতেন, যা তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যি এবং গানের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি এনে দেয়। ফলে তিনি অবিলম্বে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে শুরু করেন। আজিমপুরে যেতেন সেগুনবাগিচা থেকে বাসে করে, 'মুড়ির টিন' বলে ব্যঙ্গ করা হতো যে সিটি সার্ভিসের বাসগুলোকে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিযুগে লীলা নাগ থেকে শুরু করে ফজিলাতুন্নেসা, এঁদের পরম্পরাই তো সন্‌জীদা! যে আগ্নেয়তা বাঙালির মধ্যে প্রথমত এম এ পাশ মহিলা তথা উচ্চশিক্ষার্থে বিলেতযাত্রী ফজিলাতুন্নেসার বক্তৃতায় উঠে এসেছিল ১৯৩০-এ (সন্‌জীদার জন্মের আগে!) কলকাতার এলবার্ট হলে 'বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ-সেবক সঙ্ঘ' আয়োজিত বক্তৃতায়, তার মর্মমূলেই তো রয়েছে সন্‌জীদা তথা বাঙালি নারীমাত্রেরই উদার আকাশের প্রতি আহ্বান! ফজিলাতুন্নেসা সেদিন সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে পুরুষের সঙ্গে নারীর অধিকার নিয়ে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন, 'The highest form of society is one in which every man and woman is free to develop his or her individuality and to enrich the society what is more characteritic of himself or herself.' এই যে সমাজে নারী-পুরুষের সহযোগী হয়ে এগোনোর কথা বলা হলো, তার সম্প্রসারণই তো সন্‌জীদার আত্মজীবনীর দৃঢ় ঘোষণার মধ্যে স্পষ্ট : 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনই আমার কাজের ক্ষেত্র। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও বাঙালি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সংরক্ষণ আমার উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্র।' পরম্পরা একেই বলব। এই পরম্পরার মধ্যে সন্‌জীদার ইডেন কলেজে পড়ার ভূমিকাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা দীর্ঘ দশ বছর ধরে ফজিলাতুন্নেছাই তো কলেজটিতে অধ্যক্ষতা করেছিলেন, ডিগ্রি কলেজে দাঁড় করিয়ে গেছেন কলেজটিকে।

পথ মসৃণ ছিল না। পূর্বপাকিস্তান জন্ম থেকেই অভিশপ্ত। পাকিস্তান আন্দোলনের পেছনে যেসব বাঙালির অবদান, পাকিস্তান জন্ম নিতে না নিতেই ব্রাত্য হয়ে পড়লেন তাঁরা। ১৯৪০-এ ঐতিহাসিক 'পাকিস্তান প্রস্তাব' উত্থাপিত হয়েছিল যাঁর মুখ দিয়ে, সেই শের এ বাংলা ফজলুল হক, বা মুসলিম লীগের প্রাগ্রসর নেতারা–, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ আজ আর গুরুত্ব পাচ্ছেন না নবজাত দেশটিতে। অর্থনীতি রাজনীতি ধর্ম শিক্ষা সবকিছুই পশ্চিমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর নাম নয়া ঔপনিবেশিকতা।

অতএব দ্রোহ। ভাষা আন্দোলনে যার সূত্রপাত, আর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় যার সমাপ্তি। মধ্যপর্বে কতো প্রহরান্তের পাশফেরা! এর মধ্যদিয়েই পথ কেটে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগোতে হয়েছে সন্‌জীদাকে, তাঁর মতো আরো বহু মুক্তিপথের পথিককে। 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে করিস নে ভয়', রবীন্দ্রনাথের এমন বাণী থেকে সমিধ সঞ্চয় করেছেন তিনি ও তাঁরা। একটু ফিরে দেখি, সন্‌জীদা কোন্ প্রতিকূলতা থেকে আগুনপাখির মতো জেগে উঠেছেন।

বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে, ঐতিহাসিকতাকে সমীহ করলে, পিতা কাজী মোতাহার এবং কন্যা সন্‌জীদা যুগপৎ তাঁদের দায়বদ্ধতা পালন করেছেন। ষাটের দশকে বাংলাদেশের ক্রান্তিকাল। একাত্তরকে বাস্তবতা দিতে এই দশকের ভূমিকা অসীম। ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিবিদ-বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষ, বহুলাংশেই ছিলেন পশ্চিমাদের শোষণের প্রতিবাদে সোচ্চার। বিশ্ব ইতিহাসেই তখন প্রলয়নিনাদ, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, গণ আন্দোলন আর অসুন্দরের বিরুদ্ধে জেহাদ। জাপান-মার্কিন চুক্তির বিরুদ্ধে সে দেশের মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বাকে হত্যা করে আফ্রিকার দেশে দেশে বিদ্রোহের বারুদ ছড়িয়েছে, ফ্রানসে ছাত্র আন্দোলন, ব্রাজিল, গায়না, বর্মা (এখন মায়ানমার), সুদান, সর্বত্র রক্তের দামামা গোটা দশক জুড়ে। ইরান ফুঁসছে রেজা শাহ্ পহলবির 'White Revolution' নিয়ে, হল্যান্ডে কৃষকবিদ্রোহ, আমেরিকায় জন কেনেডি এবং মার্টিন লুথার কিং হত্যা, সর্বোপরি ছ বছর স্থায়ী ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৬৭-'৭৩)।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে খোদ আমেরিকাতেই 'The Days of Rage' আয়োজিত হয় যুদ্ধের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারকে দায়ী

করে। ফিলিপিনসে কমিউনিস্ট আন্দোলন ও ভারতে নক্সালবাড়ির অভ্যুদয়কেও আমাদের মনে রাখতে হবে। বিশ্বপরিস্থিতির সমান তালে এগোচ্ছিল বাংলাদেশেরও ভাগ্যতরি। আর হুঁশিয়ার হয়ে তরি বাইছিলেন বাংলাদেশের সুধীজন, এবং সন্‌জীদা খাতুন।

অথ সন্‌জীদা কথান

সন্‌জীদা বরাবরই শিল্প ও সৌন্দর্যকে পুরোধা করে এগিয়েছেন। পড়াশোনার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা থেকেই বাংলা সাহিত্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাতে অনার্স করেছেন। অতঃপর তাঁর শান্তিনিকেতনে পড়ার সুতীব্র ইচ্ছেকে বাধা দেননি পিতামাতা। সেখান থেকে এম এ পাশ করার পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীতও শিখেছেন শান্তিদেব ঘোষ ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। গান তিনি শিখে আসছিলেন কামরুন্নেসা স্কুলে পাঠরত অবস্থা থেকেই। সঙ্গীতানুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছেন। এগারো ভাইবোনের সংসার হলেও পিতা কোনো ছেলেমেয়ের কারুবাসনা অপূর্ণ রাখেননি। সন্‌জীদার রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রীতি কিন্তু বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়াকালীন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের 'সঞ্চয়িতা' পাঠদানের ফলে। ওই যে রবীন্দ্রনাথকে ধরলেন, চিরসখার মতো, আজও তাঁকে নিয়েই আছেন।

ফিরে এলেন শান্তিনিকেতন থেকে। যুক্ত হলেন অধ্যাপনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলা বিভাগ সেসময়কার এক অত্যুজ্জ্বল বিভায় মণ্ডিত ছিল। মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান, আনোয়ার পাশা, নীলিমা ইব্রাহিম,–এক পরিকীর্ণ সারস্বতকুঞ্জ! পরবর্তীকালে যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আহমদ শরীফ চেয়ার পদে আসীন হবেন, তাঁর শিক্ষার্থীদের অনেককেই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে দেখতে পাবেন।

১৯৫৬-এ বিবাহ। ওয়াহিদুল হকের সঙ্গে। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন। ওয়াহিদুল সাহেব সাংবাদিক ছিলেন। আর মননে-চিন্তনে-স্বপ্নে-আদর্শে-দিনযাপনে রবীন্দ্রঅন্তপ্রাণ, প্রগতিশীল, মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল মানুষ। স্বামী-স্ত্রী মিলে বাংলাদেশের নন্দনভুবনকে হীরকোজ্জ্বল করলেন একেবারে। ওয়াহিদুল হক (১৩.০৩.১৯৩৩–২৭.০১.২০০৭) আজ আর নেই, তবে শাশ্বত অগ্নিশিখা, আগুনের পরশমণি হয়ে জেগে আছে, উত্তরোত্তর প্রদীপ্ত হচ্ছে তাঁদের হীরকদ্যুতির কারুবাসনাসমূহ।

সন্‌জীদা খানিক পরবর্তী পর্বে আবার গেলেন শান্তিনিকেতনে, গবেষণা করতে। সন্‌জীদার অন্যতম পরিচয় লেখক গবেষকরূপে। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ' ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। শান্তিনিকেতন তাঁর সতত শান্তির স্থান। বিশ্বভারতীও তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিভূষিত করে এই আশ্রমকন্যাকে বরণ করতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেনি। আর কলকাতার টেগোর ইনস্টিটিউট তাঁকে যথার্থ সম্মানিত করেছে 'রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য' শিরোপা দিয়ে। তারও অধিক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৬ সালে সন্‌জীদাকে ভূষিত করেছেন রবীন্দ্র পুরস্কারে, 'ধ্বনি থেকে কবিতা' প্রবন্ধগ্রন্থের জন্য। সেবার শঙ্খ ঘোষও 'ধূম লেগেছে হৃৎকমলে' কাব্যগ্রন্থের জন্য ওই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। মজার কথা হলো, সেবার সন্‌জীদা বিদেশি হিশেবে ওই পুরস্কার পান। একই সঙ্গে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তও সেবার পান, যিনি আসলে পূর্ববঙ্গ তথা ঢাকার ভূমিপুত্র!

এইসূত্রে সন্‌জীদার লেখকসত্তা নিয়ে দু-চার কথা। নানা বিষয় নিয়েই তিনি লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা নিতান্ত কম নয়, কুড়িটি। এগুলোর মধ্যে তাঁর প্রাণের মানুষ মহা আপন রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আছে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ', 'রবীন্দ্রনাথ বিবিধ সন্ধান', 'রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ'। আরো দুখণ্ডে 'আমার রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রকবিতার গহনে', 'রবীন্দ্রনাথের হাতে হাত রেখে', 'রবীন্দ্রনাথ : তার আকাশভরা কোলে', রবীন্দ্রসঙ্গীত : মননে'। অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে 'ধ্বনি থেকে কবিতা', 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', 'ধ্বনির কথা আবৃত্তির কথা', 'স্বাধীনতার অভিযাত্রা'। আছে তাঁর আত্মজীবনী : 'অতীত দিনের স্মৃতি।' আছে তাঁর পিতাকে নিয়ে বই, 'কাজী মোতাহার হোসেন'। এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি ফেলো সন্‌জীদা আমাদের আশ্চর্য করেন তাঁর নিজের লেখা সৃজনশীল গ্রন্থের বই বের করে, 'গল্পসংগ্রহ।'

সন্‌জীদা খাতুন ও ছায়ানট-কথা

সন্‌জীদা খাতুন ও ছায়ানট যেন একে অপরের পরিপূরক। সারা জীবনে বহু ক্রিয়াশীলতার মধ্যদিয়ে গিয়েছেন ও যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু ছায়ানট তাঁর বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা হার। তিনি ও ছায়ানট সমার্থক আজ।

সাতচল্লিশ পরবর্তী পূর্ববঙ্গে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে ওঠে, যাদের মধ্যে 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী', 'ক্রান্তি', 'উদীচী' অন্যতম। রাজনৈতিক শোষণ ও পূর্ববঙ্গকে নিপীড়নের প্রতিবাদে কখনো

পরোক্ষভাবে কখনো সরাসরি ভূমিকা রেখেছিল এইসব সংগঠন। 'ছায়ানট' এমনি আর এক আগ্নেয় প্রতিষ্ঠান, ১৯৬৭-তে জন্মে আজ পর্যন্ত যার ভূমিকা দেশের ঐতিহ্যকে বাংলাদেশের গভীর থেকে গভীরতায় নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সংস্কৃতিমান নাগরিক গড়ে তোলা। ওয়াহিদুল হক ও সন্‌জীদা খাতুনের মানস সন্তান এই ছায়ানট। মূলত রবীন্দ্রনাথের আদর্শে গড়ে ওঠা সঙ্ঘ, কাজী নজরুলের প্রিয় নামটিকে জয়ধ্বজা করে এগিয়ে চলেছে বহু চড়াই-উৎরাই, উপলব্যজথিত গতি নিয়ে।

আজ ছায়ানট এক মহীরুহ। এর জন্ম হয়েছিল ১৯৬৭-তে, বাঙালি ও বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যকে সাধারণের মধ্যে অনুস্যূত করার লক্ষ্য নিয়ে। সূচনাকাল ১৯৬১, যখন রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ পালন সরকারি হস্তক্ষেপে বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম হয়। ঢাকার নবাব তথা তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনের এই অপসিদ্ধান্তটি নাকচ করে দিয়ে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারস ইনসটিটিউটে রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। কলীম শরাফী, ভক্তিময় সেনগুপ্ত, আতিকুল ইসলাম প্রমুখ যেমন, তেমনি ওয়াহিদুল-সন্‌জীদাও এখানে শামিল হন। ড্রামা সার্কেল মঞ্চস্থ করে 'তাসের দেশ'। বাফা-র উদ্যোগে শান্তিনিকেতন থেকে শিল্পীরা এসে 'শ্যামা' মঞ্চস্থ করে। হাসান ইমামদের অধ্যইক্ষতায় অভিনীত হয় 'রক্তকরবী'। এমনিতেই বাহান্নো পরবর্তী একুশের প্রভাতফেরিতে সন্‌জীদাদের কণ্ঠে থাকত রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার' বা 'আমার সোনার বাংলা' গান। থাকতো' কে এসে যায় ফিরে ফিরে, বা কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।' আইয়ুব খাঁর আমলে মিলিটারি ধর্ষণ করল চট্টগ্রামের বৌদ্ধ মেয়েদের। 'অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আবির্ভাব', লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছায়ানট সেই বৌদ্ধ মেয়েদের প্রতিবাদী হতে শেখায় 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' তাদের কণ্ঠে এনে দিয়ে। বাহান্নোর মতো তাই একষট্টিও পূর্ববঙ্গর ইতিহাসে একটি ঘুরে দাঁড়ানোর বছর, প্রহরান্তের পাশ ফেরা।

সাতষট্টিতে রমনার বটমূলে পহেলাবৈশাখের প্রভাতফেরি ও প্রতিবাদ, বেতারে ও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের বিরুদ্ধে। বাঙালির বর্ষবরণ অনুষ্ঠান কিন্তু ছায়ানট শুরু করেছিল আগেই, ছোট পরিসরে, ইংলিশ প্রিপারেটরিতে। পরে রমনায়, বৃহত্তর স্থান জুড়ে। চুরাশি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' এনে একে বর্ধিত মাত্রা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান বেতারে গাইতেন সন্‌জীদা (যদিও এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, নজরুলসঙ্গীত পরিবেশন দিয়েই বেতারে তাঁর সঙ্গীতজীবন শুরু)। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী আবদুল আহাদেরও ভূমিকা ছিল বেতারে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের, যেমন ছিল মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনিসুজ্জামান প্রমুখ সারস্বতচর্চাকারীদের। শেষোক্তজন বিভিন্ন জনের লেখা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি প্রবন্ধসঙ্কলন সম্পাদনা করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

ছায়ানট বাংলাদেশের এক বটবৃক্ষের নাম, যাকে অশ্রু-মেধা-স্বেদ -রক্ত দিয়ে তৈরি করেছেন, বর্ধিতায়ন করেছেন সন্‌জীদা খাতুন এবং ওয়াহিদুল হক। এর একাধিক ডানা,–সঙ্গীত, আবৃত্তি ('কণ্ঠশীলন'), 'ব্রতচারী' 'নালন্দা', যা একটি ব্যতিক্রমী শিশুশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ২০০১ সালের পহেলা বৈশাখ যখন বোমায় আক্রান্ত হয় ছায়ানট, সেসময় সন্‌জীদার মাথায় আসে, পরিশীলিত মানুষ না তৈরি হলে সংস্কৃতিচর্চা বৃথ াই কেবল। সেই ভাবনা থেকেই 'নালন্দা'। আজ এর মডেলকে শিরোধার্য করে যশোর ('অক্ষর', উদীচী), খুলনা, চট্টগ্রাম, রংপুর, ঢাকার অন্যত্র ('অরণি') গড়ে উঠেছে অনুরূপ বিদ্যালয়।

অটিস্টিক শিশুদের ভাবনাও সন্‌জীদার মাথায় সক্রিয়। তাই গড়ে উঠেছে 'সুরের জাদু'। আর আছে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ', নিয়ত দেশময় রবীন্দ্রনাথের গানকে বুঝবার-জানবার-শিখবার ও অনুপ্রেরণা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে। কেবল পহেলা বৈশাখই নয়, ছায়ানট বাঙলার ষড়ঋতুকে আহ্বান জানায় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, বসন্তোৎসব, বর্ষাবরণ, নবান্ন উৎসবের মাধ্যমে।

কেবল রবীন্দ্রনাথে সীমাবদ্ধ নন সন্‌জীদা, পঞ্চকবিসহ লোকসঙ্গীত, ধ্রুপদী সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত, সঙ্গীতের সামূহিক ভুবন আসন পেতেছে ছায়ানট-এ। আছে লালন, হাসন, বিজয় সরকারের গান। নিজে খুব বেশি রেকর্ড করেননি, তবে ছায়ানটের শিল্পীদের রয়েছে থরেবিথরে রেকর্ড, সি ডি।

একদা সরকারের কোপে পড়ে রংপুরে নির্বাসিত হতে হয়েছিল তাঁকে অধ্যাপনায়। তাঁর অপরাধ, তিনি শান্তিনিকেতনী, অতএব...। আর এখন তাঁর পরিচয় দেশের সর্বত্র রবীন্দ্রনাথকে উজ্জ্বল, আরো উজ্জ্বল করে তুলে ধরা। বিধাতার পরিহাস!

কথা কথা কথা

একাত্তর ও সন্‌জীদা তো আর এক মহাপর্ব। ঢাকা ছেড়ে কলকাতা। মুক্তিযুদ্ধ তিনি করলেন গানের মাধ্যমে। সেই প্রথম ছায়ানট পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপিত করতে পারল না ঢাকায়। (পরবর্তীতে অতিমারির জন্যও দুবছর বন্ধ ছিল)। কলকাতা শান্তিনিকেতন দিল্লি যেতে হচ্ছে তাঁকে গান নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা একদিকে, অন্যদিকে অর্থসংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গান তাৎপর্যপূর্ণভাবে চলে এলো তাঁর কণ্ঠে, মাতৃবিচ্ছেদের গান,–রূপান্তরের গান! গাইলেন, 'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ গান গাহিয়ে / নগরে প্রান্তরে বনে বনে। / অশ্রু ঝরে দু নয়নে / পাষান হৃদয় কাঁপে সে কাহিনী শুনিয়ে'। গাইলেন 'ঢাকো রে মুখ চন্দ্রমা।' সন্‌জীদা, আদর করে প্রিয়জনেরা যাঁকে মিনু নামে ডাকেন, এগারো ভাইবোনের ঠিক মধ্যবর্তী যিনি (তাঁর সবচেয়ে বড় বোনের চেয়ে দশ বছরের ছোট তিনি, আর কনিষ্ঠ বোনের চেয়ে ঠিক ঐ দশ বছরের বড়ো), আজ তিনি পরিব্রাজক ও ভ্রাম্যমাণ, মাতৃমুক্তিপণে নিয়োজিত এক নাজুক যোদ্ধা, যাঁর অস্ত্র গান, কেবল গান! মিটল একাত্তর, স্বাধীন হলো দেশ, ঢাকায় ফিরলেন তিনি। স্বাধীন দেশ, নব আনন্দে জাগবার দিন। রমনার বটমূল আরো উৎসবমুখর হবে এখন থেকে। মজার কথা হলো, ওটা আদপেই বটমূল না, অশ্বত্থমূল।

তাঁকে নিয়ে কথার শেষ নেই। তাঁর পুত্রবধূ এবং ছায়াসঙ্গী লাইসা আহমেদ লিসা বলেন, এই বয়সেও তিনি ছায়ানট সভাপতি হিসেবে সংস্থাটি সম্পর্কে যাবতীয় নির্দেশ দেন ও সেই অনুযায়ী এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে বুদ্ধিজীবী, আমজনতার কাছে এক শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় নাম সন্‌জীদা।

জন্মদিনের মুখর তিথির কথা

০৪.০৪.২০২৩-এ সন্‌জীদা খাতুনের নব্বইতম জন্মদিন উদযাপিত হলো ধানমণ্ডির 'ছায়ানট' ভবনে। বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে সত্য ও সুন্দরের বাণীবাহী সন্‌জীদাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলো। 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর' পরিবেশনের পর মণিপুরী শিল্পীরা সম্মেলক নৃত্য পরিবেশন করলেন। গান শোনালেন সন্‌জীদা-সহোদরা ফাহমিদা, 'ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে।' সঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন 'ছায়ানট'-এ যাঁর সঙ্গীতশিক্ষা হয়েছিল ওয়াহিদুল-সন্‌জীদার হাত ধরে, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পী সেই ইফফাত আরা। লাইসা আহমেদ লিসা গাইলেন সময়োপযোগী ও অতীব তাৎপর্যপূর্ণ গান, 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ'। আবৃত্তিতে ছিলেন জাহিরুল হক। লালনগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি এবং অতুলপ্রসাদের গানও ছিল যথাক্রমে চন্দনা ('আমারে কি রাখবেন গুরু'), ফারহানা আক্তার শার্লি (আমি সারা সকালটি বসে বসে) এবং সুমন মজুমদার (ওগো নিঠুর দরদী)-এর কণ্ঠে। ছিল সম্মেলক নৃত্য 'ভরতনাট্যআম্' দলের। রামেন্দু মজুমদার, মেজবাহ্ কামাল, মামুনুর রশীদ, ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়সহ বহু গুণীজনের উপস্থিতিতে যাপিত হয়েছিল জন্মদিনটি।

শতায়ু ছুঁতে আর মাত্র দশটি বছর তাঁর। ইতোমধ্যে শতচন্দ্রমা (একশোটি পূর্ণিমা) দেখেছেন তিনি। আমরা চাই শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হোক তাঁকে নিয়ে। লালন শাহ্, মধ্যযুগে কোটালিপাড়ার মধুসূদন সরস্বতী, 'সওগাত'-সম্পাদক নাসির উদ্দীন, নীরদচন্দ্র চৌধুরী শতায়ু ছিলেন। তাই প্রার্থনাটা মোটেই অমূলক নয়। উপনিষদ উদ্ধৃত করে বলা যাক, 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা', অর্থাৎ কাজ করতে করতেই তিনি শতবর্ষ পার করুন।

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় ॥ কবি ও নাট্যকার

ছোটগল্প

পল অনুপল

হামীম কামরুল হক

একটা মাছি কিছুক্ষণ পরপর পিঠে আর মুখে এসে বসছে। দুপুরে খাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নেওয়া রাইদার পুরোনো অভ্যাস। মাহতাবের কথায়, এই আরামটুকুর লোভেই নাকি রাইদার জীবনে আর কিছু করা হলো না। মাছিটার যন্ত্রণায় ঘুমটা কেবল এসেছিল, কেটে গেল। রাইদা চিৎকার করে ডাকল, লহমা, এই লহমা! মেয়েটাকে কোনোদিন এক ডাকে পাওয়া যায় না।–বিরক্ত হয়ে আরো জোরে একবার ডাক দেয়, এই লহমা! কোথাও গান বেজে চলেছে, ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে...। রাইদা আবারও চেঁচিয়ে লহমাকে ডাক দেয়। লহমা এলে ইলেকট্রিক মসকুইটো জ্যাপারটা আনতে বলত।

পল এসে দরজায় দাঁড়ায়; হাতে জ্যাপারটা। পলকে দেখে ও হাতে জ্যাপারটা দেখেই রাইদার বিরক্তি এক নিমেষে জল হয়ে যায়। চাঁদের মতো ফুটফুটে ছেলে। এমন একটা ছেলে রেখে ফওজিয়া মরে গেল! ফওজিয়ার সুন্দর মুখটা একদম পলের মুখে বসানো।

মায়ের চেহারা পেলে ছেলেরা বলে সুখী হয়, নাকি দুঃখী হয়–এরকম কী একটা যেন কুসংস্কার আছে। মেয়েরা বাপের চেহারা পেলে সুখী হয়; মায়ের চেহারা পেলে দুঃখী হয়।– রাইদা তো তার বাপের চেহারাই পেয়েছিল। সুখী আর হলো কোথায়!

মাহতাবের এমন কোনো বাজে দিক নেই যে ছিল না। কত রকমের নেশা যে ছিল। ড্রাগের নেশা, মেয়েমানুষের নেশা। জুয়া। তাও মাসের পর মাস টাকা দিয়ে গেছে। আশা ছিল ঠিক হয়ে যাবে। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। কেবল কোনো কোনো দিন ছবি আঁকত পাগলের মতো... এটা দেখেই সব মেনে নিয়েছিল।

ফওজিয়াই বলেছিল, সে মরে গেলে পলকে যেন সে-ই দেখে। পলকে তো আর আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়, সাঈদকে বিয়ে করতে হবে। সাঈদকে দেখলে মনে হবে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারে না, কিন্তু ভয়ানক রাগী মানুষ। ফওজিয়া বলেছিল, চেহারা যেমন, সে ভেতরেও তেমন, রাগটা তার আসে আর যায়। কখনো পুষে রাখে না। সাঈদ মানুষটা কিন্তু ভালো। মনটা খোলা। তুই মানিয়ে নিতে পারবি। তুই তো কম রাগী নস। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে। দুই রাগী মিলে সহযোগী হয়ে যাবি। বলে, অনেক দিন পর খুব মজার যেন একটা কথা বলেছে দেখে হাসতে চাইল। পারল না। হাসলে পেটের ভেতরে টান পড়ে; তবু নাজুক দুর্বল শরীরে ফওজিয়ার মুখটা খুব ঝলমলে লেগেছিল।

রাইদা একা ছিল অনেকদিন। ঠিক করেছিল আর কখনো বিয়েই করবে না। ঢাকা শহরে থাকার চিন্তা নেই। বাবা মরে যাওয়ার অনেক আগেই বাড়িটা তার নামেই লিখে দিয়েছিল। ভাই বোন কেউ ছিল না। চাচাফুপুরা বা কেউ যেন কোনোরকমের ঝামেলা না করে–পুরো ব্যবস্থা করে গিয়েছিল বাবা।

বাবার বছর পাঁচেক আগে মা মারা যায়। তারপর থেকে বাবাকে সেই দেখেশুনে রেখেছিল। পাঁচতলা দুই ইউনিটের বাড়ি। দোতলাটা তারা থাকে বলে একটা ইউনিটে করা হয়েছে। প্রতি তলায় ভাড়া এখন কুড়ি হাজার। সব তলার রুমগুলো বড় বড়। প্রচুর আলো-বাতাস। বাড়িটার সামনে ও পাশে দুদিকেই রাস্তা চলে গেছে। আরেকটা দিক খোলামেলা। সব মিলিয়ে একলাখ ষাট হাজার টাকা তার একাউন্টে জমা হয়।

ফওজিয়াকে সে বলেছিল, সাঈদ যদি তার বাসায় মানে তাদের বাড়িতে এসে থাকতে রাজি হয়, তাহলেই সম্ভব। সাঈদের রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। তখন চাকরি ছিল না। এর ভেতরে ফওজিয়ার পল হওয়ার পর হঠাৎ করে এত অসুস্থ হওয়া শুরু করল! ব্যাংকে যা টাকা ছিল জলের মতো সব খরচ হয়ে গেল। ফওজিয়ার মতো লম্বা চওড়া মেয়ে; শরীরস্বাস্থ্যে হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে, শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল।

করোনার সময়ে নানান বিপত্তি মিলে, তাও ঢাকা শহরে টিকে ছিল ফওজিয়ার অফিসের কারণে। হাসপাতালের খরচের বড় একটা অংশ অফিস দিয়েছিল। ফওজিয়ার বস লোকটার বলে বিশেষ নজর ছিল। ফওজিয়া যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে এজন্য তিনি একটু বেশি মরিয়াও ছিলেন। অফিসের সবচেয়ে কাজের লোক ছিল বলে ফওজিয়া। ওর ওপর নির্ভর করেই অফিসটা দাঁড়িয়ে গেছে। যখনই কোনো সমস্যা হয়েছে ফওজিয়াকে দিয়ে সেটা কেটে গেছে। ফওজিয়া নাসরিন সংক্ষেপে ফ. না.। অফিসের লোকেরা আড়ালে ওকে ফণা বলা হতো। বন্দুকের গুল্লি মিস হতে পারে, ফণার ছোবল মিস হবে না। ফণা কারো ওপর বিলা মানে তার কপাল পুড়ল। করোনায় অনেককে ছাটাই করলেও ফওজিয়া স্বাভাবিকভাবেই বহালতবিয়তে ছিল। কম্পিউটারে ও বলে দারুণ দক্ষ। কেউ কেউ বলে, দুরো কীসের দক্ষতাটক্ষতা; বসের সঙ্গে ওর একটা গোপন ইয়ে আছে, ইয়ে মানে কনটাক্ট; মানে লেনাদেনা। ব্যবসার কাজে যখন যেখানে তাকে যেভাবে লাগবে ফওজিয়া রাজি হবে। টাকা কোনো বিষয় নয়।– যদিও নিশ্চিত করে বিষয়টা কেউ জানে না। রহস্য রহস্য গন্ধ ছিল।

সাঈদের কানে এসব যে আসেনি তা নয়, কিন্তু কিছু করার ছিল না। নিজের চাকরির কোনো ঠিক নেই। আজ একটা ধরে তো কাল একটা ছাড়ে। ঢাকা শহরে ভদ্রমতো থাকতে গেলে, এখন কত টাকা লাগে, ভাবা যায়!

এত টাকা সে কোথায় পাবে! ফওজিয়াকে জীবন থেকে বাদ দিলে, ঢাকা শহরে থাকা বাদ দিতে হবে। সব ছেড়েটেড়ে গ্রামে চলে যেতে হবে। মরে গেলেও সাঈদুর রহমান ওরফে মনোয়ার আর গ্রামে ফিরে যেতে রাজি নয়। শহরেই বা সে কী এমন মধু পেয়েছে! একসময় তার একটা নেশা ছিল জয়নুল গ্যালারি, শিল্পকলা চিত্রক দৃক, যত গ্যালারি আছে– সেখানে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেওয়ার।– এই ছবি দেখা ও এসব নিয়ে লেখাটাই ছিল তার আনন্দের জগৎ। এটাও তার কেটে গেছে! এতগুলো এনজিওতে কাজ করল, কিছুদিন এ পত্রিকায় সে পত্রিকায়, তারপর একটা ব্যবসা করতে গিয়ে পুরো লোকসানে পড়ে ফের চাকরি। সেই চাকরি আবার করোনার সময় চলে গেল। সেই আগের মনটাই হারিয়ে ফেলেছে সাঈদ।

কোনো অফিসেই বেশিদিন চাকরি না করার জন্য, সে কোনো দিকেই কোনো খুঁটি গাড়তে পারেনি। ফওজিয়া ছিল বলে রক্ষা। ফওজিয়া দেখতে ভালোই শুধু না, বউ হিসেবেও ভালো। কী জাদু আছে কে জানে! ঘরের সব গুছিয়ে অফিসের সব গুছিয়ে দিব্যি রেখেছিল তাকে। শুধু বাচ্চাকাচ্চা নিতে চাইত না। বলত পরে। তারপর হঠাৎ পল এসে গেল। আর চলে যেতে হলো ফওজিয়াকে।

মাঝে মাঝেই ফওজিয়াকে বিদেশে ট্যুরে যেতে হতো। বলত, যখন দৌড়াতে পারব না, তখন বাচ্চাকাচ্চার কথা ভাবা যাবে। ট্যুর থেকে ফিরে এলে বড় একটা অ্যালাউন্স পেত। লোকে বলত, দিয়ে থুয়ে রসেবশে বেশ আছে মক্ষিরানি নাগিণী সাপিণী। বসের কাছে 'ওজি' বলে একটা ফাইল আছে। ওটা দেখতে পেলেই সবকিছুর গোমর ফাঁস হয়ে যেতে পারে। 'ওজি' ফাইল! আরে 'ওজি' মানে বোঝো না ফওজিয়ার ভেতরে থাকা ওজি। ফ-ওজি-য়া।

২.

পলকে দেখে রাইদা গলা একদম নামিয়ে আনে। পলের হাত থেকে ব্যাটটা নেয়। নরম করে বলে, আপু কোথায় আব্বু?

–ঘরেই তো ছিল। ঘুমানোর আগে দেখেছিলাম। উঠে আর দেখিনি।

ফওজিয়ার নিজের খুলনা-সাতক্ষীরা টান থাকলেও ছেলের সঙ্গে সে একদম শুদ্ধ ভাষায় কথা বলত। এজন্য পলের ভাষা এত শুদ্ধ সুন্দর।

ছেলের নাম পল রেখেছিস কেন, ইংরেজি ইংরেজি নাম!

পল মানে ইংরেজি পল না। পল মানে মুহূর্ত।

হঠাৎ পল কেন?

ফওজিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার জীবনের প্রথম প্রেম ছিল উপল, আফিলুদ্দিন উপল।

বাব্বা! পুরোনো প্রেম ভাতে বাড়ে! সাঈদ জানে!

পাগল নাকি! সাঈদের আছে শুধু পাছা ভরা রাগ। ও আমার কিছু জানে না। যত কম জানবে, তত বেশি মানবে।– আছে না একটা কথা। তবে সাঈদ কিন্তু একেবারে ভেঁড়ুয়া না। নিজের সব দিকে খুব খেয়াল। কোনোদিন তেমন কোনো অসুখে ভোগেনি। হালকা জ্বর সর্দি কাশি, পেটখারাপ ছাড়া ওর কোনো অসুখবিসুখ হতে দেখিনি। আরেকটা বিষয় আছে সাঈদের। ফওজিয়া রহস্য করে। মুখে দুষ্টু মিষ্টি হাসি।

কী আরেকটা?

ওর ভেতরে এলেই মনে হয় আমার সারা শরীর যেন ভরে উঠেছে। দম নিতে পারি না। ব্যথাও লাগে, মজাও লাগে।

তাই নাকি!

বিশাল! একটু থেমে বলে, ওর মনটাও কিন্তু বড়। আমাকে কখনো অসম্মান করেনি।

রাইদার চোখে কেমন একটা ছায়া পড়ে। সাঈদকে নিয়ে ফওজিয়া এমন সুখের গল্প করেই যেত। কোনোকিছু বাদ যেত না। রাইদার শুনতে কেমন কেমন লাগত। যেমন লাগত স্কুলে পড়ার সেই সময়টায়–দুই বান্ধবী মিলে বড়দের নিষিদ্ধ বইপত্র ভাগাভাগি করে পড়ত। রাইদার বোধ হয় এই একটা গোপন ব্যাপার আছে। তবে ফওজিয়ার মতো সে কোনোকালেই ছেলেঘেঁষা ছিল না। অসুস্থ হওয়ার পর, যতবারই দেখতে গেছে, ফওজিয়া বারবারই পল ও সাইদের প্রসঙ্গ তোলে। একটু একটু করেই কি ফওজিয়া তার মগজের ভেতরে সাঈদকে মিশিয়ে দিয়েছে।

মাহতাব মারা যাওয়ার সময় লহমার বয়স ছিল দশ বছর। এখন লহমা কলেজে পড়ে। মেয়েটা একদম কথা শোনে না। বাপের মতো উড়নচণ্ডী হওয়ার সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, আরেকটু বয়স হলেই বিয়ে দিয়ে দিতে হবে।– পরেই মনে হয়, ছিঃ ছিঃ কোনোভাবেই লেখাপড়া শেষ না করে বিয়ে দেবে না। কিন্তু এমন উড়নচণ্ডী মেয়েকে নিয়ে সে কী করবে!

পল যেভাবে জড়োসড়ো হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রাইদার চেহারাটায় নাকি রাগি রাগি ভাব। সাঈদও বলে। এজন্য পল মনে হয় একটু গুটিয়ে থাকে।

ও কিছু না। তাছাড়া মাত্র দুমাস হলো। দুম করে তো সব হবে না।

যে-ফওজিয়া বাচ্চাকাচ্চা চাইত না, সে-ই ছেলেটাকে এক্কেবারে মাথায় তুলে রাখত। বারবার বলত, রাখব না, আমার ছেলে খুব ব্রিলিয়ান্ট হবে, দেখে নিও।

আহারে! মা মরা ছেলেটা।– রাইদা মুখে না বললেও ভেতরে ভেতরে বলত। রাইদার খুব ছেলের শখ ছিল। লহমা হওয়ার পর মনে করেছিল দ্বিতীয়বারে মা হবে, কিন্তু তার আগেই বলা নেই কওয়া নেই দুম করে মাহতাব শেষ। তাও বলে রাস্তায় পড়েছিল। লোকজন ম্যানিব্যাগ আর মোবাইল দিয়ে বের করেছিল ঠিকানা। মাহতাব কোনোদিন অ্যান্ডরয়েড ফোন নিতে চায়নি। অদ্ভুত সব বিষয় ছিল মাহতাব পারভেজের। মানুষটাকে মেলানো যেত না। ওই একটা গুণই ছিল: মাঝে মাঝেই সারাদিন পাগলের মতো ছবি আঁকত। বন্ধুরা কত করে বলল, এটা একক প্রদর্শনী করতে। না। শিল্প নিয়ে কোনো ব্যবসা হবে না। আশ্চর্য! ছবি বিক্রি করা কী পাপ নাকি! তাহলে ছবি আঁকিস কেন? আঁকি আমার আনন্দে। জয়নুল, কামরুল, সুলতানের পর যে বিদেশিপনায় আমাদের পেল তার প্রতিবাদই আমার ছবি।

ঝাঁকড়া চুলের শক্তপোক্ত কাঠামোর লোক ছিল মাহতাব পারভেজ ওরফে মা.পা.। চারুকলায় পড়ার সময় মিহি নামে একটা মেয়ের সঙ্গে অনেকদিন সম্পর্ক ছিল। মিহির জন্যই নাকি কোনোমতে দাঁতে দাঁত চেপে অনার্সটা শেষ করেছিল। এর পর আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিসীমানায় যায়নি। রাইদার সঙ্গে সম্বন্ধ এলো। মাহতাব আস্ত একটা বাড়ি পেয়ে যাবে। হবু শ্বশুরের একটাই মেয়ে। স্টুডিও করতে পারবে নিজের মতো করে। কেন যে রাজি হয়েছিল রাইদা! ছেলে আর্টিস্ট। বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। দুটা বোনের পর এই একটাই ভাই। বোনদের অনেক আগে বিয়ে হয়েছে। মফস্বলে থাকে। কীভাবে কোন তালে-গোলে মাহতাবের সঙ্গে যে জুড়ে গিয়েছিল!

বিয়ের কেবল একটা দিন তারা সারাদিন একসঙ্গে ছিল। সেদিন কী কারণে কে জানে, প্রতিটি মুহূর্ত মাহতাব এত প্রাণবন্ত উচ্ছল ছিল। বলতে গেলে, একদিনেই ঢাকা শহরের সব ঐতিহাসিক জায়গায় গিয়েছিল দুজনে। লালবাগ, আহসান মঞ্জিল, ছোটকাটরা–বড় কাটরা, আন্টাঘর ভিক্টোরিয়া পার্ক মানে বাহাদুরশাহ পার্ক, বলধা গার্ডেন হয়ে রূপলাল হাউস থেকে চলে গিয়েছিল বুড়িগঙ্গায়। বসিলার দিকে এসে শেষ হয়েছিল সফর। সময়টি ছিল আঠাশ বা উনত্রিশে রমজান। ঈদ করতে ঢাকা শহর ফাঁকা করে দিয়ে দেশের বাড়ি চলে গেছে সবাই। ঢাকা শহরে যে এত সুন্দর–এত মনোরম মনোহর, এর আগে কোনো দিন রাইদা টের পায়নি। সবসময় ঘরকুনো মেয়ে। লেখাপড়া যদ্দিন করেছে স্কুল কলেজে গেছে। তারপর লালমাটিয়া কলেজ থেকে ইতিহাসে এম.এ. করে ইতি।

সেদিন টমটমে চড়েছিল, নৌকায় ঘুরেছিল। সোজা কথা রাইদাকে মুগ্ধ-বিমুগ্ধ করে দিয়েছিল মাহতাব। বসিলার দিকে নদীপাড়ে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখে নৌকা ভেড়াতে বলে মাহতাব। জুতাটুতা খুলে কাদা মেখে পাড়ে যায়। গাছে উঠে কৃষ্ণচূড়া ফুল পেড়ে এনে খোঁপায় পরিয়ে দেয়। রাইদা অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। আসলে শুরুতেই, দেখে মাহতাবকে মনে হয়েছিল, এর সঙ্গে তার যাবে।

আসলে ও যত দিন ফ্রিল্যান্সার ছিল, ততদিন ভালো ছিল। বড় একটা কোম্পানির চাকরিতে ঢুকল। লিন্ডা আশার নামের এক সাদাচামড়ার পাল্লায় পড়ল। তারপর কী থেকে কী হয়ে গেল। দামি দামি সব নেশায় ধরল। এল.এস.ডি-র জোগাড় করত লিন্ডা। লিন্ডা তাকে বলে, জগৎসেরা পেইন্টার বানিয়ে দেবে। নীলনয়না স্বর্ণকেশী অপূর্ব দেহবল্লরীর সুন্দরী লিন্ডা! বারবার নিষেধ করার পরও লিন্ডাকে বাসায় এনেছিল মাহতাব। উছিলা : স্টুডিও দেখানো–এখন কী কাজ করছে দেখানো। সেই কাজ কত দিন ধরে স্তূপাকার পড়ে আছে। মাহতাব মারা যাওয়ার পর প্রতিটি কাজ রাইদা অনেক যত্ন করে রেখেছে। কোনটা ফ্রেম করে রাখতে হবে, কোনটা কোন ধরনের কীসে মোড়াতে হবে–সব।

৩.

সাঈদ কোনো ট্যাঁ ফোঁ না করে এই বাসায় উঠেছিল। দোতলাটা জুড়ে খাবারঘর বসার ঘর বাদে চারটা বেড রুমের একটা রুম ভরে ছিল মাহতাবের কাজ। দুটো টানা বারান্দা, তিনটা বাথরুম।

বাড়িতে ওঠার সময় সাঈদের কিছু বই আর কীসব পত্র-পত্রিকা, এনজিওতে কাজ করার সময়, যে নিউজ লেটারে কাজ করত, সেগুলো একটা জায়গায় রাখতে গিয়ে রাইদা দেখে, এক গাদা পত্রিকায় মনোয়ার সাঈদ নামে বিভিন্ন চিত্রপ্রদর্শনীর আলোচনা। তখনই হঠাৎ কথাটা মাথায় আসে। যদিও সে নিশ্চত ছিল না, সাঈদ বিষয়টা কীভাবে নেবে; হাজার হলেও স্ত্রীর আগে স্বামীর কাজ নিয়ে পরের স্বামী কি কখনো লিখতে রাজি হবে?

সাঈদ শুরু থেকেই মাঝে মাঝেই রাইদাকে বলেছিল, কী করা যায় বলো তো? আমার কোনো একটা কাজ দরকার, কিন্তু কিছু ভাবতে পারছি না। কোথাও কারো কাছে যেতে ইচ্ছা করে না। অনুরোধ-টনুরোধ সাধাসাধি আমাকে দিয়ে এখন আর হবে না।

মাহতাব শিল্পী হিসেবে রাতারাতি কোনো নাম কামাতে চায়নি। বড় শিল্পী হবে; ভালো ছবি আঁকার জন্য যা যা করার সব করবে; নীলকণ্ঠ হবে; জীবনের সব বিষ নিয়ে শিল্পে অমৃত ফলাবে–সেটাই ছিল ওর সব কথার শেষ কথা; তবে তার কাজ যারাই দেখেছে সুনাম করেছে। সেই মানুষটির কাজ নিয়ে সাঈদ যদি কিছু করতে পারে।–এটা কি তাকে বলা যায়?

অনেক বিষয়ে রাইদা আগে থেকেই সাঈদকে বলেছিল, তারা কীভাবে আসলে তাদের এই একসঙ্গে থাকাটাকে চালিয়ে যাবে, মাহতাবের বিষয়টা শুধু যদি সামলে নিতে পারে দুজনে। কারণ তুলনা এসে পড়তে পারে সবকিছুতে, তাই না। সেটার হাত থেকে দুজনকেই নিজেদের রক্ষা করতে হবে।

ফওজিয়া নিশ্চিত ছিল সাঈদ রাইদাকে সুখী করবে। কানায় কানায় পূর্ণ করবে। ফওজিয়া মারাত্মক কটা কথা বলেছিল, সাঈদের সঙ্গে তার বোঝাপাড়টা ভালো ছিল; কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কেউ আসলে কাউকে ভালোবাসত না। চাহিদা পূরণ, প্রয়োজনপূরণ–এই জায়গা থেকেই টিকে ছিল যা টেকার। কেউ কারো প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারেনি। প্রায় সব পুরুষের মতোই সাঈদও চাপা একটা প্রেমিকমানুষ ছিল, যে ভালোবাসা চায়। আর রাইদার যত যাই হোক, ভালো না বেসে তো আর কারো সঙ্গে সে এখন থাকতে পারে না, যদিও আগে প্রেমট্রেম করে নিয়ে, পরে একসঙ্গে থাকা শুরু করা যায়, কিন্তু সাঈদের সঙ্গে তার এরকম কোনো সম্ভাবনা ছিল না।।

রাইদার নানি নাকি বলত, মেয়েরা হইল চার প্রকার : অগ্নিকন্যা, মাটিরকন্যা, জলকন্যা আর হাওয়াকন্যা। বাকিরা হলো এই চার ধরনেরই যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ। রাইদা কী কন্যা? অগ্নিকন্যা বা জলকন্যা? মাটির বা হাওয়াকন্যা সে নয়–নিশ্চত। কিন্তু অগ্নি বোঝা যায় তার রাগে, কিন্তু সে নিমেষে জল হয়ে যেতে পারে। লহমার ওপর এই যে রেগে উঠেই পলকে দেখেই জল–এই তো রাইদা! নাকি! আসলে ওইসব সবই কথার কথা। মানুষ একেক সময়ে একেক রকম–পল অনুপলের ভেতর সে বদলে যেতে পারে। মাহতাব মনে করত : যেকোনো মানুষ যেকানো সময় যেকারো সঙ্গে যেকোনো ধরনের আচরণ করতে পারে; ফলে যে বন্ধু পিচ্চিকালের, দুম করে সে এমন কিছু করতে পারে যা কেউ স্বপ্নেও ভাবে না।

তোমার জীবনে এমন ঘটেছে?

না।

তাহলে কী করে বুঝলে?

সবকিছু আমার জীবনে ঘটলেই কি বুঝতে হবে? তবে না ঘটলেও আমি আগে থেকে কিছু কিছু লোকের বেলায় সাবধান হয়েছি।

সাঈদ আবার বলে, জীবনে শেষ কথা বলে কিছু নেই। এমন কি মৃত্যুও জীবনের শেষ কথা নয়। মৃত্যুর পরও বহু মানুষ অনেক মানুষের মনের ভেতরে, মগজের ভেতরে রয়ে যায়।– এই কথাটা মনে আছে রাইদার। ফলে সে সাঈদকে বলতেই পারে, মাহতাবের কাজগুলো দেখে তার মগজে কিছু তৈরি হয় কিনা; আর এখন তো সাঈদ বাধাধরা কিছু করছে না। কাজটা হাতে নিলে নিজেরও একটা ব্যস্ততার জগৎ তৈরি হয়। ভালো কোনো একটা কিছু, কাজের কোনো একটা কিছু নিয়ে মেতে থাকতে পারলেই আর চিন্তা থাকে না। কিন্তু বললে আবার... দুই মাস হলো তাদের বিয়ের। সবকিছু ঠিকঠাকমতো চলছে।

সাঈদ আরও একদিন বলেছিল, কাজ মানে সেখান থেকে আয় আসবে–এটাই নয়, একটা কিছু নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকা।

আমাদের তো থাকা খাওয়ার সমস্যা নেই। তাহলে এত অস্থির হচ্ছো কেন?

প্রসঙ্গটা আর একবার উঠলেই সে ওই পত্রিকায় থাকা সাঈদের চিত্রপ্রদর্শনী নিয়ে লেখাগুলো দেখিয়ে বলবে, এগুলো তো তারই লেখা? ফলে রাইদা তাকে একটা কাজের সন্ধান দিতে পারে; আর সেটা হলো এই–বলে, নিয়ে যাবে মাহতাবের সেই স্টুডিওতে; তারপর কী ঘটবে না ঘটবে–আগাম বলা যাচ্ছে না।

৪.

পলের হাত থেকে ব্যাটটা নিয়ে রাইদা উড়ে বেড়ানো মাছিটাকে যেমাত্র পাশের বালিশে বসল, আস্তে করে সেটার ওপর ব্যাটটা নিয়ে ধরে। মাছিটা চুম্বকের মতো ব্যাটে এসে সেঁটে যায়। ছোট্ট একটা ফুলকি আর কির কির আওয়াজ দিয়ে মাছিটা জ্বলেপুড়ে খাক। উফ শান্তি! কিন্তু ঘুমটা তো গেল!

আচ্ছা সাঈদ তো আজকে বাসায়ই ছিল। বাসায় থাকলেই সে কেবলই অস্থির থাকে। মাঝে মাঝে রাইদাই বলে, যাও, কোথাও ঘুরে আসো। সাঈদও জানে ঘুরে এলে ভালো লাগবে কিনা নিশ্চিত নয়, তবে অস্থিরতা কমবে।

পল তখনও বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে তার নতুন মায়ের মাছি মারা দেখছিল। মাছিটা নাশ হলে, রাইদা পলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। এগিয়ে এসে পলের সামনে বসে; তার কপালে একটা চুমু খায়, থ্যাঙ্ক ইয়ু সোনা। যাও আব্বু, ব্যাটটা যেখানে ছিল, রেখে এসো।

কী করে ছেলেটা বুঝল জ্যাপারটাই চাই! রাইদা ও লহমার ভেতরে প্রায় এই ব্যাটটা নিয়ে হালকা বসচা হয়। রাইদা বলে, জিনিসটা একজনের হাতে ব্যবহার হলে আরো ভালো থাকত। লহমা একদিন বলে, তোমার কি টাকা কম! একটা কিনে নিলেই তো পারো। আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো কী হয়েছেরে বাবা! এত্ত ত্যাঁদড়!

পল ব্যাটটা নিয়ে আবার লক্ষ্মী ছেলের মতো চলে যায়। এত্ত আদর লাগে ছেলেটাকে! ফওজিয়া না বললেও এই ছেলেটার জন্য সে সাঈদের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়ে যেত। ভাগ্যিস কলকাতা থেকে ফেরার পথে এয়ারপোর্টে ফওজিয়ার সঙ্গে দেখাটা হয়েছিল। সেদিন সঙ্গে ফওজিয়ার বস ছিল; আর রাইদা বাবাকে ডাক্তার দেখিয়ে কলকাতা থেকে ফিরেছিল।

রাইদা শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে একবার লহমা ও পলের ঘরে একনজর তাকায়। পল মেঝেতে পাটির ওপর বসে; একমনে খেলনা নিয়ে এরই ভেতরে মেতে গেছে। তিন নম্বর রুমটায় কেউ বেড়াতে এলে থাকে, যদিও গত দশ বছরে তেমন কোনো মেহমান তাদের বাসায় এসে রাতে থেকে যায়নি। কোণে যে-বড় ঘর সেটাই মাহতাবের স্টুডিয়ো ছিল। সাধারণত তালা বন্ধ থাকে। খোলা দেখে রাইদা একটু অবাক হয়। লহমা মাঝে মাঝে বাবার এই স্টুডিয়োতে ঢোকে।

ঘরটা দরজায় দাঁড়াতেই রাইদা দেখে : সাঈদ দেওয়ালে টানানো মাহতাবের 'ভবিতব্য' ছবিটা একটা দিকে আর একবার 'তথৈবচ' ছবিটার দিকে তাকাচ্ছে।

রাইদা এসেছে টের পেয়ে সাঈদ তার দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে, একটা কাজ পাওয়া গেল।

মানে?

অনেক আগে চিত্রসমালোচনা লিখতাম। মাহতাবের ছবিগুলো নিয়ে একটা বই হলে কেমন হয়?

রাইদা বরারবই চাপা। অদ্ভুত একটা বিষয় কাজ করে। আগের স্বামী, যে মারা গেছে, তার কাজ নিয়ে পরের স্বামী লিখতে নিজে থেকেই চাইছে। অবিশ্বাস্য!

ফওজিয়া বলেছিল, সাঈদের মনটাও অনেক বড়। তোর অমর্যাদা হবে না।

রাইদা নরম কণ্ঠে, সমস্ত খুশি আনন্দ উচ্ছ্বাস চাপা দিয়ে বলে, মন্দ হয় না।

হামীম কামরুল হক ॥ কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

বকেয়া হিসেব

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বকেয়া হিসেব

অজানা নম্বর থেকে বারংবার আসা ফোন তছনছ করে দেয় একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থালি। অভিনয় ও মডেলিংয়ের আগ্রহ ওঠে কাঠগড়ায়। চলে দুই বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে চাপান উতোর তাদের কন্যার ভবিষ্যৎ গড়া নিয়েও। এক সুন্দরী বিদুষী নারীর স্বপ্ন পূরণের তাগিদে বিপদ আমন্ত্রণ, না এক ইন্টেলিজেন্স আধিকারিকের পেশা ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জটিলতা, নাকি এক নিষ্পাপ শিশুর মা-বাবার কৃতকর্মের ফল ভোগ? কিন্তু কে বকেয়া হিসেবের খাতা খুলে বসে আছে? ব্যাস্, এটুকুই সুতো ছাড়া রইল। বাকিটা নিজেরাই আবিষ্কার করুন পাঠক–কীভাবে কল্পিত খলনায়ক ও কাল্পনিক গোয়েন্দা আর অহেতুক রহস্যের অযৌক্তিক জাল ব্যতিরেকে একেবারে বাস্তব সমাজ রাজনীতি কূটনীতি থেকে তুলে আনা বিষয়, আইবি, সন্ত্রাসবাদ, ফিল্মজগতের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের রসায়ন পরতে পরতে ঘনীভূত হয়েছে। লেখিকা মনে করেন, বাস্তব হলো কল্পনার চেয়েও রহস্যময়। 'বকেয়া হিসেব' সেই রহস্যাবৃত বাস্তবকে আশ্রয় করেই।

এখনো খাতা পেন হাতে না নিলে লেখা আসে না। তবে সুযোগমতো বাংলা কোনো প্যাকেজ নিয়ে নিলে লেখালিখিতেও হয়তো সুবিধা হবে। আবার চাকরির সাইটগুলোতেও আবেদন পাঠানো যাবে।

আভাসের বক্তব্য, 'কোনো একটাতে ফোকাস করো। এতকিছু নিয়ে হাঁকপাঁক করলে কোনোটাই হয় না।'

এই অনুসন্ধান করতে গিয়েই খুঁজে পেল সুইফ্টার নামের বিনে পয়সায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার এক জায়গা। নিজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর গাদাগাদা ইমেইল আসে। সেই মেল থেকে সুইফটারের বিজ্ঞাপন দেখেই এক জায়গায় ফোন করেছিল সংযুক্তা। শিশুশিল্পী চাই। ফোনের এ প্রান্ত থেকে লোকটার ব্যবহার বেশ ভালো লেগেছিল। তার মেইল আইডিতে নিজের ও হিয়ার ছবি পাঠায়। ছবি পেয়ে বিজ্ঞাপনদাতা একদিন ফোন করে সুবিধামতো সময়ে সংযুক্তাকে যেতে বলেছিল গড়িয়ায়।

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাবে বলায় আভাস প্রচণ্ড আপত্তি করেছিল। একটা ঝামেলা চলছে, আবার একটাকে আমন্ত্রণ জানানোর কী দরকার? দেখছেই তো বিজ্ঞাপন দেখে ফোন করতে গিয়েই কী কাণ্ড বাধল।

অজানা লোকের কথায় তার ডেরায় গিয়ে হাজির হলে না জানি আর কী বিপদ উপস্থিত হবে। একা যাওয়ার চেয়েও বেশি বিপদ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায়। সংযুক্তা আভাসকে বলল, 'তাহলে ফোন করে লোকটার সঙ্গে কথা বলে নাও। যদি সন্তোষজনক লাগে তাহলে যাব।'

'আমার দায় পড়েছে ফোন করতে। তোমার শখ, মেটাও।' আভাস ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপনদাতার ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান চালিয়ে বলল, 'মেয়েটাকে সাবধানে চোখে চোখে রেখো। দিনকাল খুব খারাপ।'

এভাবে বলা মানেই সবুজ সংকেত।

জায়গাটা পাটুলি ছাড়িয়ে। গড়িয়া শুনে ট্রেনে করে গিয়েছিল। কন্যে নিয়ে সুখচরের গঙ্গার ঘাট থেকে রিকশা ধরে সোদপুর স্টেশন, লাইন দিয়ে টিকিট কাটা, ভিড় মহিলা কামরায় ঠেলাগুঁতো আর খেতে খেতে শিয়ালদা উত্তর, সেখান থেকে হেঁটে শিয়ালদা দক্ষিণ, সেখান থেকে গড়িয়ায়, স্টেশনে হিয়ার চিরুণি দিয়ে চুল ঠিক করে রিকশা অটোর খোঁজ, একে তাকে পথ ও যান নির্দেশ জিজ্ঞাসা, ফোন করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে নির্দিষ্ট স্টপেজ জানতে চাওয়া, অটো থেকে নেমে সেল ফোন কানে লাগিয়ে নির্দেশমতো মেয়ের হাত ধরে হাঁটা, গেটে দারোয়ানের কাছে নাম ঠিকানা উদ্দেশ্য জানিয়ে গোলকধাঁধা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠা এবং সেখানে আর এক প্রস্থ গোলকধাঁধা নকশা পেরিয়ে সাজানো গোছানো সুশীতল অফিসঘরে প্রবেশ। সাক্ষাতের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হলেও কি বাচ্চা নিয়ে আবার আসা সম্ভব হবে?

ভদ্রলোকের নাম দেবমাল্য সেন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বেঁটে মোটা এক মানুষ। কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার।

'আসতে অসুবিধা হলো? কীসে করে এলেন?'

'অসুবিধা মানে অনেকটা পথ তো, বারবার ট্রান্সপোর্ট চেঞ্জ করতে করতে আসা।'

'কোথা থেকে আসছেন যেন? আগরপাড়া?'

'সুখচর।'

'সেটা কোথায়? আপনি নর্থ থেকে আসছেন তো?'

'সুখচর পানিহাটির উত্তরে। সোদপুর স্টেশন থেকে দূর আছে। বাসে গেলে বিটি রোড বরাবর সোদপুর স্টপেজটা ছাড়িয়ে আরও একটু নর্থে এগোতে হয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি ফোনে বলেছিলেন বটে। আসলে আমার এক বোন, নিজের নয় কাজিন, আগরপাড়ায় থাকে। আমার তখন থেকে এটাই মনে আছে আপনি আগরপাড়ার কাছাকাছি নর্থের কোনো একটা জায়গা থেকে আসবেন। চা না কফি?'

'ঠিক আছে। থাক না।'

'সে কী। প্রথমবার এলেন অত কষ্ট করে। তুমি কী খাবে? বিস্কুট?'

'কফি খাব।' পুট করে বলল হিয়া। বাড়িতে চকোলেট মিশিয়েও দুধ খাওয়াতে যুদ্ধ করতে হয়। পেটে দুধ চালানের জন্য কয়েকবার কফি মিশিয়ে দিয়েছে। হিয়া ওয়াক তুলেছে। এমনি কফি করলেও কোনো দিন খেতে চায়নি।

'ও কিন্তু বাড়িতে কফি মোটেই খায় না। বিস্কুটও খাবে কিনা ভরসা নেই। খাওয়ার বদলে গুঁড়ো করে মেঝেতে ছড়িয়ে দেয়।'

'আরে এখানে মুড হয়েছে খাবে। আপনি সংকোচ করছেন কেন? আমি তো এই সময় চা খাই।' দেবমাল্য ফোন, সম্ভবত ইন্টারকম তুলে তিন কাপ কফি পাঠাতে বলল।

কফি এলে ভালোই। মেয়েটার আজ বিকেলে কিছু খাওয়া হবে না। বাচ্চাদের বিশ্বাস নেই; মা-বাবাকে অপ্রস্তুত করতে সাধারণত যা অপছন্দ করে, অন্যের বাড়ি গিয়ে সেটা বেমালুম সাঁটিয়ে দেয়। লোকটার ভদ্রতা জ্ঞান আছে।

টুকটাক আলাপ পরিচয়ের পর দেখা গেল দেবমাল্যর এইসব বিজ্ঞাপন তৈরি করার ব্যবসা ছাড়াও শঙ্করপুরে হোটেল আছে, বীচ ডিলাইট। তাছাড়া বিদেশে বিভিন্ন ধরনের জিনিস আমদানি রপ্তানির কারবার আছে। বেশ বড় সংস্থা। কাজ পেলে ভালোই হবে মনে হচ্ছে। কফি এনে দিলো একটা লোক। সত্যজিৎ রায়ের গল্পে ছাড়া পুরুষ চাকর খুব কম বাড়িতে দেখা যায়। ছেলেদের খাঁই বেশি, নির্ভরতা কম বলে বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত বাড়িতে কাজের মহিলাই দেখা যায়, কাজের পুরুষ নয়।

নতুন দিশা

হিয়া বেশ জুত করে কফি খেল। বিস্কুট দুটোও ফেলল না। শুধু এই খেয়ে তো হবে না; বাইরে বেরিয়ে একটা আইসক্রিম কিনে দেবে বিকেলের খাওয়ার বিকল্প হিসেবে। কফি পর্বের পর দেবমাল্য একখানা সাধারণ ডিজিটাল ক্যামেরা বার করে বলল, 'আপনাদের দুজনের ছবিই মেইলে পেয়েছি। ছবিগুলো কি বাড়িতেই তোলা? প্রফেশনাল হ্যান্ড নয়, তবে লুকটা বোঝা যায়। চলুন আপনার কিছু ছবি তুলে রাখি।'

সাধারণ ডিজিটাল ক্যামেরায় হিয়ার কয়েকটা যা ছবি উঠল তা সংযুক্তার নিজের ছবিগুলোর চেয়ে কোনো অংশে ভালো নয়। দেবমাল্য বলল, 'আমাদের ক্যামেরাম্যান আজ নেই। ওর কাছে এসএলআর ক্যামেরা আছে। আর একদিন এলে অবন্তিকা আর আপনার একটা ফটোসেশন করে যেতে হবে। আপনাদের পোর্টফোলিও আছে?'

'না এখনো করাইনি। অডিশনে তো পুরো ক্যান্ডিডেটকেই জাজ করা যায়। আর পোর্টফোলিওর দরকার কী?'

'দরকার আছে বই কি। কোনো বড় প্রোডাকশন হাউস পোর্টফোলিও ছাড়া ক্যান্ডিডেটকে অডিশনেই ডাকবে না। এখন চেনাশোনা হলে আলাদা কথা। আরে যারা রেগুলার কাজ করে তারাই প্রতি বছর একটা করে পোর্টফোলিও করিয়ে নেয়।'

মরেছে! তাহলে পোর্টফোলিও করাতে হবে গাদাগুচ্ছের খরচ করে? হিয়ারটা করিয়ে রাখা যায়। নিজের জন্য আর খরচ করাটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

দেবমাল্য আবার বলল, 'আমরা কিন্তু ক্যান্ডিডেট শর্টলিস্টেড হলে তাদের ফটোসেশন করিয়ে নিজেরাই একটা পোর্টফোলিও বানিয়ে নিই। তার জন্য কিছু দিতে হয় না। আপনার আর অবন্তিকাকে সেজন্য আর একবার সময় করে এখানে আসতে হবে। আমি বলে দেব।'

মনটা আনন্দে নেচে উঠল। কিন্তু সংযুক্তার একটাও ছবি উঠল না। তবে মধ্যে মধ্যে হিয়ার ছবি তোলার চেষ্টা করতে কিন্তু সফল হলো।

'কী ব্যাপার বলুন তো? অবন্তিকার ছবি উঠছে, অথচ আপনার একটাও উঠল না। ক্যামেরাটা মাঝেমধ্যে গণ্ডগোল করছে কয়েকদিন থেকেই।'

'আপনার ক্যামেরার আমাকে পছন্দ হয়নি বোধ হয়। আপনি অবন্তিকার কথা ভাবুন। আমি অ্যাকচুয়ালি ওর কেরিয়ার তৈরি করব বলেই নিজে কাজ শুরু করেছি। কিন্তু আমার কোঅর্ডিনেটররা এমন ছ্যাঁচড় যে, কাজ করা মানে লোকসান। আমার মেয়ে কিন্তু এক বছর আর দেড় বছর বয়সে দুটো ভালো কাজ পেয়েছিল। তারপর আর কেউ ডাকেনি। সেই জন্যই নতুন করে উদ্যোগ নিয়েছি।'

লোকটা সংযুক্তার মুখে ওর আগে কাজের অভিজ্ঞতার খানিক বৃত্তান্ত শুনে বলল, 'সে কী! কাজ করিয়ে পারিশ্রমিক দেবে না, জুলুমবাজি নাকি? অবশ্য এরকম হয় না যে তা নয়। আমরা তো কোনো ক্যারেক্টার প্লে করলে নাম করা না হলেও তাকে দেড় দু হাজারের কম দিই না। এমনকি অডিশনে ডাকলেই কনভেন্সটা পে করি।'

দেবমাল্য সেন সংযুক্তারা বেরোনোর আগে 'এক মিনিট' বলে একটা চারশো টাকার চেক খামে মুড়ে ধরিয়ে দিলো, 'এটা রাখুন, যদিও সামান্যই। অডিশন ফি বলতে পারেন। যদিও আপনার ছবি তোলা গেল না। নেক্সট্ টাইম যাবে আই হোপ।'

যারপরনাই অবাক হলেও প্রকাশ করল না। প্রফুল্ল মনে মেয়েকে নিয়ে ট্যাক্সি করে শিয়ালদা। সেখান থেকে অবশ্য যুদ্ধ। বাড়ি ফিরে বেশ হৃষ্ট চিত্তে সাক্ষাতের বিবরণ দিলো আভাসের কাছে। কদিন বাদে ওকে নাগাল্যান্ডে চলে যেতে হবে। বিয়ের পর থেকে বেশিরভাগই একা থেকেছে, এক সময় সম্পূর্ণ একা, তারপর মেয়ের দায়িত্বসহ একা। বাচ্চা বড় না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব, নির্ভরতা নয়। আভাস তো বৌ বাচ্চাকে ফেলে থাকতে হবে আশঙ্কায় সন্তানের দায়িত্ব সংযুক্তার ঘাড়ে ফেলতেই চায়নি। বাচ্চার জন্য সংযুক্তারই ব্যাকুলতা ছিল। কিন্তু বছর দুয়েক একসাথে থাকার পর এখন আবার একা থাকতে হবে ভাবলে মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়ছে। বেশ কিছুদিন ধরে মন মরা ও উদ্বিগ্ন থাকার পর আজ মনটা আবার একটু উৎফুল্ল। আভাসের কাছে মুখ রইল।

ঠাণ্ডা কোনো তরল পানের ইচ্ছা হচ্ছিল। অরেঞ্জ স্কোয়াশের কথা আভাসকেও বলা যায়। কিন্তু এইসব কাজের উদ্দেশে বাইরে গেলেও

বাড়ির কাজে যে ক্লান্তি আসবে না, সেটা প্রমাণ করার জন্য সংযুক্তা স্নানঘর থেকে হাত পা ধুয়ে এসে বলল, 'শরবত খাবে, করব? ট্রেনের ভিড় আর গরম থেকে বেরোনোর পর পর ঠাণ্ডা কিছু খেতে ইচ্ছা করছে। কোল্ড ড্রিংক্সের বোতল ভেবেছিলাম বাবুদার দোকান থেকে। কিন্তু আজ দেখছি দোকান বৃহস্পতিবার না হওয়া সত্ত্বেও বন্ধ।'

'করো।'

'হিয়া অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাবি?' হিয়ার বিরিয়ানি আর মুরগির মাংস ছাড়া কোনটা পছন্দের খাদ্য বা পানীয় এখনো বোঝা যায় না। ওর মা শুধু জানে কোনটা ওকে গেলানো সম্ভব। উপাদেয় পানীয়ও অনেক খেতে চায় না বা এক চুমুক দিয়ে ফেলে রাখে।

হিয়াকে বার ছয়েক প্রশ্ন করার পর উত্তর এল, 'খাবো। না না খাবো না। ঠিক আছে একটু দিয়ো। না, খাবো না...'

একটা জগে জলে চিনি ফেলে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখল। কাঁধে তোয়ালে ফেলে সংযুক্তা বলল, 'আমি ঝট্ ঘা ধুয়ে আসি। ততক্ষণ চিনিটা জলে ভিজুক।'

গা মুছে পাউডার ছড়িয়ে আড়াই গ্লাস শরবত বানিয়ে আরাম করে বসল বরের মুখোমুখি।

ছোট ঘরে ফোন বাজছে। সংযুক্তা এগোতেই আভাস বলল, বোসো, আমি ধরছি।'

'হ্যালো, নূপুর...'

'আগেও বলেছি এখানে নূপুর নামে কেউ থাকে না!'

'উসকা নাম কভি নূপুর তো কভি ডলি তো কভি কুছ অউর। হারামিকা পিল্লা। ও ছিনাল আব তেরা সাথ রহতা। তু ভি মিলা হুয়া হেয় উসসে সাথ? মেরা রুপিয়া দে দে ব্যস...'

'তমিজসে বাতে কর জানওয়ার। ও মেরি বিবি হেয়। তেরা নাম কেয়া হেয় ও পহেলে বতা বহনচোদ? হিম্মত হেয় তো নাম পতা বতা। মেয় যাকে কৌনসা পয়সা, উসকা হিসাব লুঙ্গা। তেরে মহল্লেমে জাকে তুঝে পটকাকে আউঙ্গা। তু জানতা নেহি মেরা অউকাত কেয়া হেয়। খবরদার ফিরেসে ফোন কিয়া তো। সিধা অন্দর কর দুঙ্গা।'

'আপকি বিবিকা নাম কেয়া হেয়?'

'আপকো কিঁউ বাতাউঁ। ও কিসিসে কোই রুপিয়া নহী লী। আপ আপনা নাম তো বাতাইয়ে।'

লাইন কেটে গেল। আভাস চিৎকার করল, 'নূপুর...'

সংযুক্তা পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার বর যে অমন তুখোড় গালাগালি দিতে পারে, এতদিন জানা ছিল না। 'নূপুর' ডাক শুনে বলল, 'কী সাংঘাতিক! তোমার কাছেও আমি রিমি থেকে নূপুর হয়ে গেছি?'

'মডেলিং-এর বিজ্ঞাপন দিয়ে কী অবস্থা করেছ দেখো। আমার কাজের জায়গায় হাজারটা ঝামেলা। বাড়িতেও শান্তি দেবে না? মেয়েটা বড় হচ্ছে, তার সিকিউরিটির কথা তো ভাববে। কোথাকার কোন ফেরেব্বাজ, আমাকে খিস্তি করছে। তোমার নামে যাতা বলছে। কত সাহস বেড়েছে দেখছ? এতদিন আমি ফোন ধরলে কেটে দিত। এখন আমার সঙ্গেও! তোমার হটকারিতা আর নির্বুদ্ধিতার ফল কী হচ্ছে দেখছ তো? দুদিন বাদে আমি এখান থেকে চলে যাব। নাগাল্যান্ড থেকে হুট করে এখানে সোজা নয়। এই অবস্থায় তোমাদের রেখে যাই কী করে? মোবাইলে থেকে কল করেছ কখনও?'

'না। কিন্তু ওর নাম্বারগুলো কলার আইডি থেকে নোট করে রেখেছি। পুলিসকে জানাই?'

'ল্যান্ড লাইন কেটে দেবো। তোমার খ্যাপামির মাসুল।' আভাসের গলা চড়েই রয়েছে।

মাকেই গলা তুলতে শুনেছে হিয়া তার সাড়ে সাত বছরের জীবনে। বাবাকে অত রাগতে কোনোদিন দেখেনি। ভয়ে মাকে জড়িয়ে বলেছিল, 'মা তুমি আর ফোন ধোরো না। আমি মডেলিং করবো না। আমার বিচ্ছিরি লাগে।'

রাতে খেতে দেরি হয়ে গেল। সেটাও সংযুক্তার দোষ। আভাস মেয়েকে খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, 'এটা কি একটা বাচ্চার খাওয়ার সময়? রাত এগারোটায় খাওয়া! সাড়ে এগারোটা কি পৌনে বারোটায় শুয়ে একটা বাচ্চা কী করে ভোরে উঠে স্কুলের জন্য তৈরি হবে? মেয়ের মায়ের এখনো টীন এজ পেরোলো না, মেয়ে বড় হলে আমার কী অবস্থা হবে ভাবছি। ইনডিসিপ্লিনড্, ইমম্যাচিওরড্। নিজের মতো মেয়েটারও ভবিষ্যতের বারোটা বাজাও।'

'গাদাগাদা পড়াশুনো করে আমার কটা হাত পা গজিয়েছে? একজন আইএএস কি আইএফএস অফিসারের নামও সাধারণ মানুষ জানে না। কিন্তু মাধুরী, করিণাকে সবাই চেনে। বড় বয়সে চেষ্টা করতে গেলে কাস্ট ক্রাউচিং-এর পাল্লায় পড়তে হতে পারে। তাই এখন থেকেই কেরিয়ার তৈরির চেষ্টা করছি।'

'কার কেরিয়ার? হিয়ার না তোমার নিজের?'

উচ্চাশা

'নিজেরটাও যদি চাই তাহলেই বা দোষ কী? তোমার অতিরিক্ত উদ্বেগের ছলে শাসনে আমি অত ভালো নাটকের গ্রুপে সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দিলাম। একে রোজগার করি না, তার ওপর তুমি নাগাল্যান্ড চলে যাবে। ডবল্ এসটাবলিশমেন্ট। তার ওপর যাতায়াতের খরচটা। সিকিউরিটির চিন্তা ছাড়া এগুলোও তো ভাবায়।'

'নর্থ-ইস্টে পোস্টিং হলে ডাবল এইচ.আর.এ পাওয়া যায়। ডাবল এশটাবলিশমেন্ট মেইনটেইন করাটা গভর্নমেন্ট কমপেনসেট করে দেয়।'

সংযুক্তা বলে চলল, 'একটু সহযোগিতা করলে বিজয়লক্ষ্মীদির গ্রুপে কাজ করার সুবাদে বাংলা সিরিয়ালে একটা পাকা জায়গা হয়ে যেত। তখন মা-বাবারাও আমার কাছে এসে থাকতে তৈরি ছিল। শিলিগুড়িতে চাকরি পেয়ে তোমাদের বাড়িতে থেকে করতে চাইলাম। তোমার মা, বাবা, ভাইরা কেউ রাজি হলেন না। তুমিও কিচ্ছুটি বললে না। তুমি তো সিকিমেই পোস্টেড ছিলে, তখন সিকিমে। কলকাতার বদলে শিলিগুড়িতে যাতায়াত করাটা কি তোমারও সুবিধা হতো না? কলকাতায় পোস্টিং হতে পারে হতে পারে করে অত ভালো চাকরিটা আমায় করতে দিলে না তোমরা। যেহেতু ওনারা চান না আমি বাড়িতে থেকে খুঁটি গাড়ি, তুমিও চাইলে না।'

'বড্ড বাজে বকছ কিন্তু এবার।'

'আমি তো বাজেই বকি। আমার মা বাপের শিক্ষা সহবত তুলে যত খুশি গালাগাল করা যায়। কিন্তু তোমার পিতা-মাতা, তোমার ভ্রাতা-ভগ্নী এদের কি কোনো দোষ থাকতে পারে? আমি লিখে দিচ্ছি, তুমি ঐ বাড়িতে কোনোদিনই জায়গা পাবে না। মিতুর পড়ার ঘরের দোহাই দিয়ে তোমার ছোটভাই আর বৌ বেমালুম আমাদের ঘরখানা অধিকার করে রয়েছে।

চলবে...

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মেদিনীপুর। পৈতৃক বসবাসসূত্রে শেকড় পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার ডিশেরগড় খনি অঞ্চলে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (রসায়ন), বিএড, এমবিএ'র পর কর্মজীবন শুরু করেন ফার্মাসিউটিকল কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে। বর্তমানে একাধিক বাণিজ্যিক-অবাণিজ্যিক পত্রপত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটদের গল্প, ছড়া, ফিচার, বই বা নাটক পর্যালোচনা ইত্যাদি রচনায় নিয়োজিত। পেশাদারিভাবে ইংরেজি কনটেন্টও লিখেছেন অসংখ্য। কবিতা দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও শ্রীপর্ণার গদ্যসৃষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও ফিচারগুলো তাঁর মননের অন্যতম পরিচয়। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও অনুবাদের জন্য পেয়েছেন বঙ্গ সংস্কৃতি পুরস্কার, ঋতবাক পুরস্কার, শর্মিলা ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার, উষা ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, নবপ্রভাত রজত জয়ন্তী বর্ষ স্মারক সম্মান, প্রতিলিপি বিশেষ পুরস্কার, রাজেশ সরকার স্মৃতি পুরস্কার, পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার (মেঘদূত সাহিত্য পত্রিকা–সেরার সেরা সম্মান), ডলি মিদ্যা স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, স্মৃতি ও চেতনা পুরস্কার, People Reflections Special Recognition, সোনালি ঘোষাল পুরস্কার (অনুবাদ) ইত্যাদির মতো নানা পুরস্কার।

একনজরে ওড়িশা

দেশ	ভারত
অঞ্চল	পূর্ব ভারত
রাজধানী	ভুবনেশ্বর
জেলা	৩০টি
প্রতিষ্ঠা	১ এপ্রিল ১৯৩৬
সরকার	
• শাসকবর্গ	ওড়িশা সরকার
• রাজ্যপাল	প্রফেসর ড. গণেশী লাল
• মুখ্যমন্ত্রী	নবীন পট্টনায়ক (বিজেডি)
• বিধান সভা	এককক্ষবিশিষ্ট (১৪৭টি আসন)
• সংসদীয় আসন	২১ লোকসভা
• হাইকোর্ট	ওড়িশা হাইকোর্ট, কটক
আয়তন	
• মোট	১,৫৫,৭০৭ বর্গকিমি (৬০,১১৯ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	৯ম
জনসংখ্যা (২০১৮)	
• মোট	৪১,৯৭৪,২১৮
• ক্রম	১১তম
• আদিবাসী সংখ্যা	৬২টি
• সাক্ষরতা	৭৩.৪৫%
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-OR
সরকারি ভাষা	ওড়িয়া
ওয়েবসাইট	www.odisha.gov.in

প্রফেসর ড. গণেশী লাল
রাজ্যপাল

নবীন পট্টনায়ক (বিজেডি)
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

ওড়িশা

মো. মোস্তাক খান

বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম, ভূপ্রকৃতি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দেশ ভারত। ভারতকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করেনি প্রকৃতি। দেশটি যেন একটা ছোট পৃথিবী। ভারতের মধ্যে উড়িশা এমনই একটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন জনপদ।

কলিঙ্গ বা ওড়িশার প্রাচীন ইতিহাসের প্রসঙ্গ মহাভারত, মহা গোবিন্দ সূত্র ও কিছু পুরাণে পাওয়া যায়। সুতপার পুত্র রাজা বালি সন্তানহীন ছিলেন। তাই তিনি দীর্ঘতমস নামক এক ঋষির কাছে সন্তান প্রার্থনা করেন এবং পঞ্চপুত্রের জনক হন। তাঁদের নাম : অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। অধুনা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের একাংশে রাজপুত্র বঙ্গ বঙ্গরাজ্যের সূচনা করেন। রাজপুত্র কলিঙ্গ অধুনা ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের কিছু জেলা নিয়ে কলিঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মৌর্য বংশের সম্রাট অশোক ২৬১ খ্রিষ্টাব্দে কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে মূলত এ দ্বন্দ্ব হয়েছিল। কলিঙ্গ তখনই তাদের সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে ব্যবসা বাণিজ্যে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। তাই কলিঙ্গ সম্রাট অশোকের একটি লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়। ভুবনেশ্বরের কাছাকাছি দয়ানদীর তীরে কলিঙ্গের সেই যুদ্ধটি হয়েছিল। সেই যুদ্ধে অনেক মানুষ নিহত ও আহত হয়।

আইকনোক্লাস্ট কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে শাহী বাংলার সৈন্যদল এ অঞ্চল দখল করে ১৫৬৮ সালে। ওড়িশা হারিয়ে ফেলে তার রাজনৈতিক পরিচয় ও স্বাধীনতা। অর্ধশতাব্দী ধরে অঞ্চলটি মারাঠাদের দখলে চলে যায়। এরপর দীর্ঘদিনের লড়াই শেষে ব্রিটিশ সরকার সাধারণ ওড়িয়া মানুষের দাবি মেনে নিয়ে ১৯৩৬ সালে পৃথক রাজ্যের প্রস্তাব গ্রহণ করে। শেষ অবধি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কিছু অংশ নিয়ে জন্ম হয় ওড়িশা রাজ্যের।

ওড়িশার ব্যুৎপত্তি

প্রাকৃত শব্দ 'ওড্ড বিষয়' (বা 'উড্র বিভাষ' বা 'ওড্র বিভাষ') থেকে ওড়িশা (ওড্ড) Odisha শব্দটি এসেছে। এই শব্দটির সন্ধান ১০২৫ সালের প্রথম রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই শিলালিপিতে পাওয়া যায়।

ভৌগোলিক অবস্থান

ওড়িশার উত্তরে ঝাড়খণ্ড, উত্তর-পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমে ছত্তিশগড়। ওড়িশা ১৭.৭৮০০° থেকে ২২.৭৩০০° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮১.৩৭০০° থেকে ৮৭.৫৩০০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখাংশের মধ্যে অবস্থিত।

জনসংখ্যা ও ভাষা

ওড়িশা একটি বহুভাষা এবং বহুজাতির রাজ্য। ওড়িশার জনসংখ্যা ৪১,৯৭৪,২১৮ জন, ২০১৮ সালের জরিপ অনুযায়ী। হিন্দু ৯৩.৬৩%, মুসলিম ২.১৭%, খ্রিষ্টান ২.৭৭%, শিখ ০.০৫%, বৌদ্ধ ০.০৩%, জৈন ০.০২%, অন্যান্য ১.১৪%। ওড়িশা রাজ্যে ৬২টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। ওড়িশার প্রধান ভাষা ওড়িয়া। এছাড়াও রয়েছে হিন্দি, কুই, সাঁওতালি, উর্দু, তেলেগু, বাংলা, মুন্ডা, সাভারা, কিষাণ প্রভৃতি।

জলবায়ু

প্রধানত চারটি ঋতু লক্ষ করা যায় ওড়িশা রাজ্যে : শীত, প্রাক-মৌসুমি, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি এবং উত্তর-পূর্ব মৌসুমি। তবে বঙ্গের মতো ওড়িশায় স্থানীয়ভাবে একটি বছরকে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত–এই ছয়টি ঋতুতে ভাগ করা হয়।

নদনদী

ওড়িশার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলো হলো–বৈতরণী, ভার্গবী, ভেদে, ব্রাহ্মণী, বুধবালাঙ্গা, চিত্রতলা, দিবা, দেবী, ধামরা, আইবি, কাদুয়া, কাঠজোড়ি, খারকাই, কৈনা, কুয়াখাই, কুশভদ্রা, মহানদী, মালাগুনি, নাগাবলি, কলাব, ঋষিকুল্যা, সবরী, শঙ্খ প্রভৃতি।

অর্থনীতি

ওড়িশার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার প্রায় ৬২% লোক কৃষি পেশার সঙ্গে জড়িত। কৃষির পাশাপাশি শিল্প এবং সেবা খাতেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ওড়িশার কয়েকটি উৎসব

রথযাত্রা

রথযাত্রা হলো একটি বার্ষিক হিন্দু উৎসব যা ওড়িশার পুরীতে উদ্ভূত হয়েছিল। উৎসবটি ওড়িশাজুড়ে পালিত হয় কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয় দিনে আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায়। উৎসবে জগন্নাথ মন্দির থেকে গুন্ডিচা মন্দিরে বিশাল রথে করে জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার দেবতাদের মূর্তি পরিবহন করা হয়। ভক্তরা দড়ি দিয়ে রথ টানে। পুরীর উৎসবে প্রতিবছর অজস্র দর্শনার্থী অংশগ্রহণ করেন।

দুর্গাপূজা

আশ্বিনে দুর্গাপূজা হয়। দুর্গার নয়টি রূপ। এ সময় নবদুর্গার পূজা হয়। পৌরাণিক কাহিনি মতে দশম দিনে দুর্গা অসুরকে হত্যা করেছিল। এ পূজাকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ওড়িশায় এছাড়া উদ্‌যাপিত হয় কালী পূজা, কুমার পূর্ণিমা, দীপাবলি, মহা শিবরাত্রী, দোল পূর্ণিমা, হোলি প্রভৃতি।

খাদ্যাভাস

ওড়িশার খাবার দাবারে বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। ওড়িশার মানুষের প্রধান খাবার ভাত। ওড়িয়া খাবারে তুলনামূলক কম তেল এবং মসলা ব্যবহার করা হয়। অনেক খাবারেই সরিষার তেল ব্যবহার করা হয়। মন্দিরের ভোগ সাধারণত ঘি দিয়ে রান্না করা হয়। পুরির বাবুর্চিদের সর্বত্র বিশেষ সুনাম রয়েছে। এক সময় বাংলায় পুরির বাবুর্চি নিযুক্ত থাকত। ওড়িশা সমুদ্র উপকূলে হওয়ায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মিষ্টি জাতীয় খাবার ওড়িশার বেশ জনপ্রিয়। এ অঞ্চলের মানুষ সাধারণত সকালে রুটি খেয়ে থাকে। দুপুর ও রাতের খাবার হিসেবে সাধারণত ভাত ও ডাল খায়।

নৃত্যকলা

নৃত্যকলায় ওডিসির ২,০০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতমুনির নাট্যশাস্ত্রে এই ওড়িশি নাচের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ আমলে নাচের রূপটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীসময়ে কয়েকজন গুরু এর পুনরুদ্ধার করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : মঙ্গলাচরণ, বাট্টু নৃত্য, পল্লবী, গীতিনাট্য, দশাবতার, মোক্ষ। নৃত্যের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে রয়েছে ঘুমুরা নৃত্য, মহারী নৃত্য, ডালখাই এবং গোটিপুয়া।

সঙ্গীত

ওড়িশি সংগীতের দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত ইতিহাস রয়েছে। খাঁটি সংগীত-শাস্ত্র গ্রন্থ, অনন্য রাগ এবং তাল এবং উপস্থাপনার একটি স্বতন্ত্র ধারা রয়েছে। ওড়িশি সংগীতের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে রয়েছে চৌপদী, ছন্দ, চম্পু, চৌতিসা, জনান, মালশ্রী, ভজন, সরিমানা, ঝুলা, কুদুকা, কোইলি, পোই, বলি এবং আরও অনেক কিছু। ওড়িয়া সঙ্গীতকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয় : রাগঙ্গ, ভঙ্গ, নাট্যাঙ্গ এবং ধ্রুবপদঙ্গ।

বালিশিল্প

ওড়িশার উপকূলীয় অংশে বালুশিল্প বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ। পুরী সমুদ্র উপকূলে মূলত এই শিল্পের ব্যাপক চলন রয়েছে। ওড়িশার বিখ্যাত বালুশিল্পীর একজন সুদর্শন পট্টনায়েক। ২০১৪ সালে ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্মান পদ্মশ্রী পেয়েছেন। পুরীতে গড়েছেন তার 'স্যান্ড আর্টস ইনস্টিটিউট'। এখানে বালুশিল্পের ওপর পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে।

চলচ্চিত্র

ওড়িয়া ভাষায় পূর্বে শব্দহীন কথাচিত্র নির্মাণ করা হতো। মোহন সুন্দর দেব গোস্বামীর নির্দেশনায় রামায়ণের কাহিনির ওপর নির্ভর করে ১৯৩৬ সালে নির্মিত হয় প্রথম ওড়িয়া চলচ্চিত্র সীতা বিবাহ। এটির গল্প কামপাল মিশ্র রচিত একটি নাটক থেকে নেওয়া হয়েছিল।

দর্শনীয় স্থান

জগন্নাথ মন্দির

পুরীর জগন্নাথ মন্দির বিখ্যাত। এই মন্দিরটি ওড়িশা বা ওড়িশার পুরীর পূর্ব সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত। এই মন্দিরটি বিখ্যাত হিন্দু তীর্থক্ষেত্র। এটি চারধামের অন্যতম যেখানে সকল ধার্মিক বৈষ্ণব হিন্দু জীবনে অন্তত একবার যেতে চান। চার ধামের মধ্যে পুরীর এই জগন্নাথ মন্দির অবশ্যই অন্যতম। দেশ-বিদেশের লাখ লাখ ভক্ত জগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য পুরীর এই মন্দিরে এসে সারাবছর ভিড় জমায়। ঐতিহাসিক এই মন্দির ১০৭৮ সালে নির্মিত। ১১৭৪ সালে তা মেরামতের পর আজকের জগন্নাথ মন্দিরের রূপ ধারণ করে। সাধারণত কোনো মন্দিরে বিগ্রহ নয় পাথর নয় ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়। কিন্তু পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা তিনজনের বিগ্রহই কাঠের তৈরি। প্রত্যেক ১২ বছর পর একটি গোপন রীতি মেনে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে নতুন শরীর দেওয়া হয়। প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গাধিপতিরূপে পাওয়া যায় মারবেন এর নাম। নিজে জৈন্য ধর্মাবলম্বী হয়েও বহু হিন্দুমন্দির তিনি নির্মাণ করেন, মারবেনের পরে তিনশ বছরের ইতিহাস প্রায় অবলুপ্ত, চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণ ওড়িশায় মারাঠা বংশের উত্থানের কথা পাওয়া যায়। যথাসম্ভব কলিঙ্গ অধিকারের পরে তারাই প্রথম শ্রীজগন্নাথকে বাসুদেব নারায়ণ রূপে পূজা করেন। সপ্তম শতাব্দীতে শৈলোদ্ভব বংশের রাজা মাধবরাজ গুপ্ত দ্বিতীয় (৬২০-৬৫০ খ্রি.) সমুদ্রপাড়ে মন্দির নির্মাণ করে নীলমাধবের পূজার্চনা করতেন বলে কথিত। শ্রী পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবের পূজার্চনার উল্লেখ পাওয়া যায় চন্দিলারাজ কীর্তিবর্মণের রাজত্বকালে (১০৪১-১০৭০)। পুরীধাম চিরদিনই সর্বত-

ঘটনাপঞ্জি ❖ এপ্রিল

ড. বি আর আম্বেদকর

০৫ এপ্রিল ১৯৩২	❖	ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৫ এপ্রিল ২০০৭	❖	কথাকার লীলা মজুমদারের মৃত্যু
০৬ এপ্রিল ১৯৩১	❖	অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের জন্ম
০৯ এপ্রিল ১৮৯৪	❖	সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ এপ্রিল ১৯৫০	❖	আইসিসিআর-এর প্রতিষ্ঠা
১০ এপ্রিল ৫৮৯ খ্রি.পূ.	❖	বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ
১০ এপ্রিল ১৯০১	❖	কবি অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম
১২ এপ্রিল ৫৯৯ খ্রি.পূ.	❖	জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম
১৪ এপ্রিল ১৮৯১	❖	সংবিধানপ্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরের জন্ম
১৫ এপ্রিল ১৮৭৭	❖	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জন্ম
১৬ এপ্রিল ১৮৮৫	❖	বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের জন্ম
১৬ এপ্রিল ১৯৫১	❖	সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের মৃত্যু
১৭ এপ্রিল ১৯৭৫	❖	রাষ্ট্রপতি সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মৃত্যু
১৭ এপ্রিল ১৯৮৩	❖	সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের মৃত্যু
১৮ এপ্রিল ১৮০৯	❖	হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্ম
২৩ এপ্রিল ১৯৯২	❖	চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু
২৬ এপ্রিল ১৯২০	❖	অংকবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের মৃত্যু
২৬ এপ্রিল ১৯৬০	❖	রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর মৃত্যু

সমন্বয় ক্ষেত্র। ভৌমকর রাজারা ছিলেন এর বড় প্রমাণ (৭৩৬ খ্রি.)। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হলেও তারা বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের প্রতি ছিলেন সমান অনুরাগী। এই সময় তন্ত্রসাধনারও প্রসার ঘটে এখানে। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (৯২৩ খ্রি.) ভৌমকর বংশের পতন হলে দক্ষিণ কোশলের শক্তিশালী সোমবংশীয় রাজা যযাতিকেশরী ওড়িশা অধিকার করেন। যযাতিকেশরীই পুরীতে মাঝারি একটি জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেন বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। সোমবংশীয় রাজাদের সময়েই নির্মিত হয় ভুবনেশ্বর লিঙ্গরাজ মন্দির, নির্মিত হয় জগন্নাথ মন্দিরসংলগ্ন নৃসিংহ মন্দির।

পুরীর জগন্নাথমন্দিরটি বেলেপাথরের তৈরি। মন্দিরের ইতিহাস এবং নির্মাণ নিয়ে বহু মত প্রচলিত রয়েছে। এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিস্তর দ্বন্দ্ব আছে। মন্দিরের চারটি দ্বার। উত্তর দিকের দরজাটি হস্তীদ্বার। দক্ষিণ দিকের দরজা অশ্বদ্বার। পূর্ব দিকের দরজা সিংহদ্বার এবং পশ্চিম দিকের দরজা ব্যাঘ্র দ্বার।

মন্দিরের গোপন কক্ষে সাতটি ঘর আছে। সেই ঘরগুলিই হলো রত্নভাণ্ডার। ৩৪ বছর আগে মাত্র তিনটি ঘরের তালা খুলতে সক্ষম হয়েছিলেন কর্মকর্তারা। বাকি ঘরগুলোতে কী আছে, তা আজও রহস্যঘেরা।

গোবর্ধনমঠ

গোবর্ধন মঠ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আদি শঙ্কর যে চারটি প্রধান মঠ স্থাপন করেছিলেন, তার একটি হলো এই গোবর্ধন মঠ। এই মঠে জগন্নাথ (ভৈরব) ও বিমলা (ভৈরবী) পূজা হয়। এই মঠের মহাবাক্য হলো 'প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম।'

ভুবনেশ্বর পর্যটন

ভুবনেশ্বরকে বলা হয় ভারতের মন্দিরের শহর, যা একসময় তার স্থাপত্যশিল্প এবং বিশাল মন্দিরের জন্য পরিচিত ছিল, বর্তমানে ভুবনেশ্বর একটি বাণিজ্য ও ব্যবসার জন্য সমৃদ্ধ কেন্দ্র। ভুবনেশ্বর একটি প্রাচীন শহর যা সুন্দর এবং ঐতিহাসিক মন্দিরে পরিপূর্ণ যা সারা দেশ থেকে তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের আকর্ষণ করে। ভুবনেশ্বর নামের আক্ষরিক অর্থ হলো মহাবিশ্বের প্রভু, এখানে অসংখ্য মন্দির রয়েছে। চমৎকার এই মন্দিরগুলো বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

ভুবনেশ্বরে আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান : লিঙ্গরাজ মন্দির, ইসকন মন্দির, হীরাকুদ বাধ, পরশুরামেশ্বর মন্দির, রাজারানী মন্দির, বিন্দু সরোবর।

চিলিকা হ্রদ

চিলিকা হ্রদ হলো একটি লোনা জলের হ্রদ এবং পূর্ব ভারতের ওড়িশা রাজ্যের পুরী, খুরদা এবং গঞ্জাম জেলাজুড়ে বিস্তৃত একটি অগভীর উপহ্রদ। ৫২টি নদী এবং খাল এখানে প্রবাহিত হয়েছে। যথাক্রমে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে চিলিকার জল যথাক্রমে ৯০০ থেকে ১১৬৫ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বিস্তৃত হয়। নাশপাতি আকৃতির লেগুনটি প্রায় ৬৪.৫ কিমি দীর্ঘ এবং এর প্রস্থ ৫ থেকে ১৮ কিমি পর্যন্ত। এটি একটি ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১.৫ কিলোমিটার প্রশস্ত একটি চ্যানেল দ্বারা বঙ্গোপসাগরের সাথে সংযুক্ত। লবণাক্ততা এবং গভীরতার ওপর ভিত্তি করে উপহ্রদটিকে বিস্তৃতভাবে চারটি পরিবেশগত খাতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা দক্ষিণাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তর অঞ্চল এবং বহিঃপ্রবাহ। লেগুনে বেশ কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কৃষ্ণপ্রসাদ, নালাবন, কালিজাই, সোমোলো এবং বার্ডস দ্বীপপুঞ্জ। ১৯৮৫-৮৭ সালে ভারতের জুওলোজিক্যাল সার্ভে লেকটিতে জরিপ চালিয়েছিল তাতে ৮০০ অধিক প্রজাতির প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়।

পঞ্চতীর্থ

পঞ্চতীর্থ বলতে ভারতের পুরী শহরে অবস্থিত পাঁচটি জলাধারকে বোঝায়। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, পুরীতে তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করতে হলে এই পাঁচটি জলাধারে স্নান করতে হয়। এই পাঁচটি জলাধার হলো :

ইন্দ্রদ্যুম্ন কুণ্ড গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে অবস্থিত। মহাভারতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও জগন্নাথ সংস্কৃতির চার প্রধান দেবতার আবির্ভাব বর্ণিত হয়েছে। এই মহাকাব্যে আছে, কীভাবে সহস্রাধিক গরুর ক্ষুরের চাপে পবিত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন জলাধার নির্মিত হয়েছিল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই জলাধার ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। রোহিনী কুণ্ড জগন্নাথ মন্দির চত্বরের মধ্যে বিমলা মন্দিরের কাছে অবস্থিত। এই কুণ্ডকে নারায়ণের বাসস্থান মনে করা হয়। এই জলাধারের কাছে অক্ষয়কল্প বট নামে একটি বটগাছকে পূজা করা হয়। পুরাণ মতে, ব্যাধ জড়শবর দুর্ঘটনাক্রমে কৃষ্ণকে হত্যা করেন এবং তাঁর সৎকার করেন। কৃষ্ণ জড়কে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, তাঁর দেহাবশেষ একটি কাঠের টুকরোয় পরিণত হয়েছে। টুকরোটি সমুদ্র থেকে রোহিণী কুণ্ডে এসে উঠবে। জড়ের সাহায্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই টুকরোটি দেখতে পান। এই টুকরোতেই জগন্নাথের মূর্তি নির্মিত হয়।

মার্কণ্ডেয় কুণ্ড হলো পুরীর তীর্থ পরিক্রমার প্রথম স্থান। জলাধারটির আয়তন ৪ একর। এর পাশে মার্কণ্ডেয়েশ্বরের মন্দির আছে।

শ্বেতগঙ্গা কুণ্ড নীলাচলের দক্ষিণে অবস্থিত। এই কুণ্ডের পাশে বিষ্ণুর মৎস্য অবতার ও রাজা শ্বেতের মন্দির আছে।

মহোদধি স্বর্গোদ্বার অঞ্চলের সমুদ্রকে 'মহোদধি' বলা হয়। এটি একটি স্নানক্ষেত্র।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

ওড়িশার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হলো বিজু পটনায়েক রাজ্যের প্রধান ও একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। আকাশপথে চলাচলের জন্য আরো কয়েকটি স্থানীয় ছোট বিমানবন্দর রয়েছে। যেমন : জয়পুর বিমানবন্দর, বীর সুরেন্দ্র সাই বিমানবন্দর, রাউরকেলা বিমানবন্দর, রেঞ্জিলুন্ডা বিমানবন্দর। সমুদ্রবন্দরের মধ্যে রয়েছে পারাদ্বীপ। এছাড়া একটি প্রধান বন্দর এবং কয়েকটি ছোট বন্দর রয়েছে। এছাড়া ওড়িশার সব শহরই রেল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত।

মো. মোস্তাক খান ॥ লেখক

আপনার মতামত জানান

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল

ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯

এক্সটেনশন : ১১৪২

inf2.dhaka@mea.gov.in

ভারত বিচিত্রায় ব্যবহৃত বেশকিছু ছবি ও অলংকরণ ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভারত বিচিত্রা বিক্রয়ের জন্য নয়

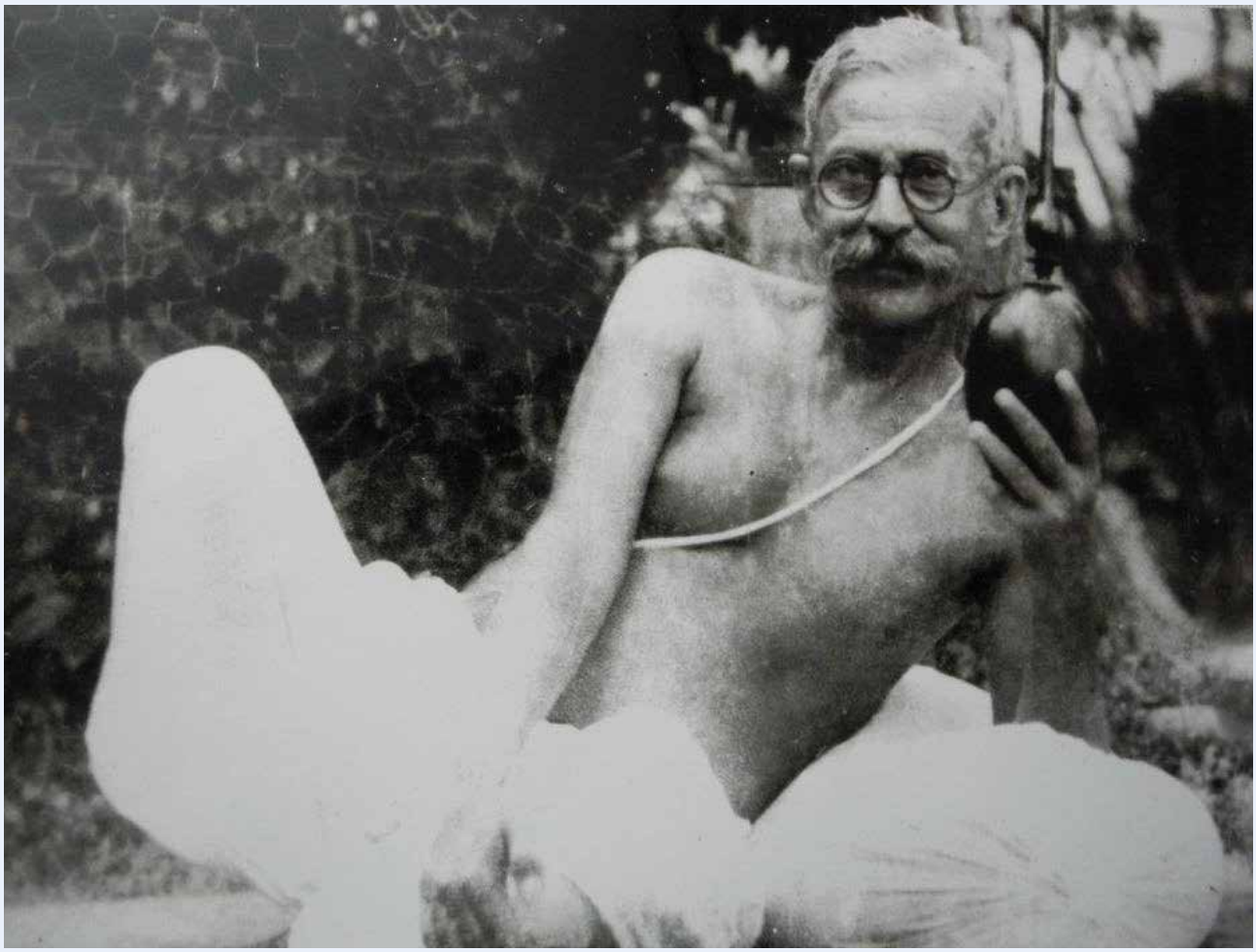

ফিচার

হাসির অবতার শ্রী শরৎচন্দ্র দাদাঠাকুরের রসিকতা

আহমেদ রিয়াজ

দাদাঠাকুর। মূল নাম শ্রী শরৎচন্দ্র পণ্ডিত হলেও দাদাঠাকুর কিংবা দা'ঠাকুর নামেই তিনি বিখ্যাত। অসম্ভব মেধাবী ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী। জঙ্গিপুর হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে বর্ধমান রাজ কলেজে এফ.এ ক্লাসে ভর্তিও হয়েছিলেন। আর্থিক দুরবস্থার কারণে আর পড়তে পারেননি। ২১ বছর বয়সে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'পণ্ডিত প্রেস'। যেখানেই শাসকের অত্যাচার ও নীতিহীনতা দেখেছেন, সেখানেই তীক্ষ্ণ আক্রমণ করতেন সরস লেখা দিয়ে। বাংলাভাষায় প্রথম প্যালিনড্রোম বা উভয়মুখী বাক্যের জনক ছিলেন তিনি। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বেশ কিছু প্রবন্ধ ও রম্য রচনাও লিখেছেন। বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দিতে সরস কবিতা রচনা করতেন মুখে মুখে।

পরম শ্রদ্ধেয়
শ্রীমদ্দাঠাকুর
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের
শ্রীচরণকমলে–
হে হাসির অবতার!
লহ গো চরণে ভক্তি-প্রণত কবির নমস্কার।
–নজরুল

এটি একটি বইয়ের উৎসর্গপত্র। বইয়ের নাম 'চন্দ্রবিন্দু'। হাসির কবিতার এ বই ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন অর্থাৎ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত। বইয়ের লেখক কাজী নজরুল ইসলাম।

কবি নজরুল তখন খ্যাতির তুঙ্গে। বিদ্রোহী কবিতার জন্য তিনি তুমুল জনপ্রিয়। জনপ্রিয় নজরুল কি না বই উৎসর্গ করলেন শরচ্চন্দ্র পণ্ডিতকে! আবার কবি তাঁকে হাসির অবতার হিসেবেও অভিহিত করেছেন। কে এই শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত?

পুরো নাম শ্রী শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। নিজের পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন এভাবে–

'আমার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত। ১২৫ ঘর নিরক্ষর চাষী অব্রাহ্মণ আমাকে কেহ বাবাঠাকুর, কেহ কাকাঠাকুর–অর্থাৎ যার যে সম্পর্ক মানায় তাই বলে ডাকত, তবে 'দাদাঠাকুর' বলে ডাকার লোক সংখ্যা খুব বেশি। তাই আমাদের পল্লীতে দাদাঠাকুর বলতে আমাকেই বোঝায়, এমন কি কলকাতার মত শহরেও আমার এই নাম জারী হয়েছে।'

শুধু নাম জারি নয়, 'দাদাঠাকুর' নামে তিনি জীবিত থাকা অবস্থাতেই পরিণত হয়েছিলেন কিংবদন্তি মানুষ হিসেবে। একেবারেই আলাদা ধরনের ব্যক্তিত্ব, অনাড়ম্বর জীবনযাপন আর অনমনীয় চরিত্র তাঁকে মহামানুষের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। সঙ্গে যোগ হয়েছিল তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসাধারণ রসিকতাবোধ এবং Wit ও Pun- এর মিশ্রণে শব্দের অদ্ভুত খেলা করার দক্ষতা।

তিনি জীবিত থাকা অবস্থাতেই তাঁর জীবনী অবলম্বনে 'দাদাঠাকুর' নামে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। সিনেমাটি অসম্ভব জনপ্রিয় তো হয়েছিলই, তাঁর চরিত্রে অভিনয় করে ছবি বিশ্বাস পেয়েছিলেন জাতীয় পুরস্কারও। ওই ছবিতে আরো অভিনয় করেছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি, সুলতা চৌধুরী ও তরুণ কুমার।

এই কিংবদন্তি দাদাঠাকুরের জন্ম ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ বা ১৮৮১ সালের ২৭ এপ্রিল। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার নলহাটি থানার সিমলাদ্দি গ্রামে। ওটা ছিল তাঁর মাতামহ ঈশানচন্দ্র রায়ের বাড়ি। তাঁর পৈতৃক নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরের দফরপুর গ্রামে। পিতা হরিলাল পণ্ডিত আর মাতা তারাসুন্দরী দেবী। মাত্র দুই বছর বয়সে পিতৃহারা হন শরৎচন্দ্র। এর চারবছর পর হন মাতৃহারা। পিতামাতাহীন শরৎচন্দ্র এরপর কাকা রসিকলালের কাছে প্রতিপালিত হন। রসিকলাল কাকা হলেও তাঁকেই তিনি বাবা ডাকতেন।

সারাজীবন কখনো জুতো পরেননি দাদাঠাকুর। তিনি নিজেই বলতেন, 'বাগদাদের রাজারা যেমন khalifa, আমারও তেমনি খালি পা।'

একবার গারস্টিন প্লেস বেতার কেন্দ্রে পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বহু ইংরেজ ভদ্রলোক আমন্ত্রিত হলেন। দাদাঠাকুরও আমন্ত্রিত। কিন্তু দাদাঠাকুরকে দেখে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর বড্ড বিরক্ত হলেন। চোখ-মুখ কুঁচকে স্পষ্ট বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন, 'আচ্ছা দাদাঠাকুর, আজকে এটা কি ঠিক হল? অতিথি সবাই পদস্থ ব্যক্তি। আপনাকে খালি পায়ে দেখে এঁরা কী ভাববে বলুন তো?'

দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন, 'কারা পদস্থ? যারা এখানে অতিথি হয়ে এসেছেন এঁরা কেউ পদস্থ নয়। পদস্থ কেবল একজন। আর সে হচ্ছি আমি। দেখুন আমার পায়ে কোনো জুতো নেই। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাকি সবাই জুতোস্থ।'

খালিপায়ের দাদাঠাকুরকে একবার একজন একজোড়া জুতো কিনে দিতে চাইল। দাদাঠাকুর নেবেন না। জোরাজুরি করতেই দাদাঠাকুর বললেন, 'তোমরা বন্ধুলোক ওসব পরো। আমাকে দলে টানছ কেন ভাই। তুমি ছাড়াও অনেকে ভালো ভালো জুতো কিনে দেবে বলেছে, আমি

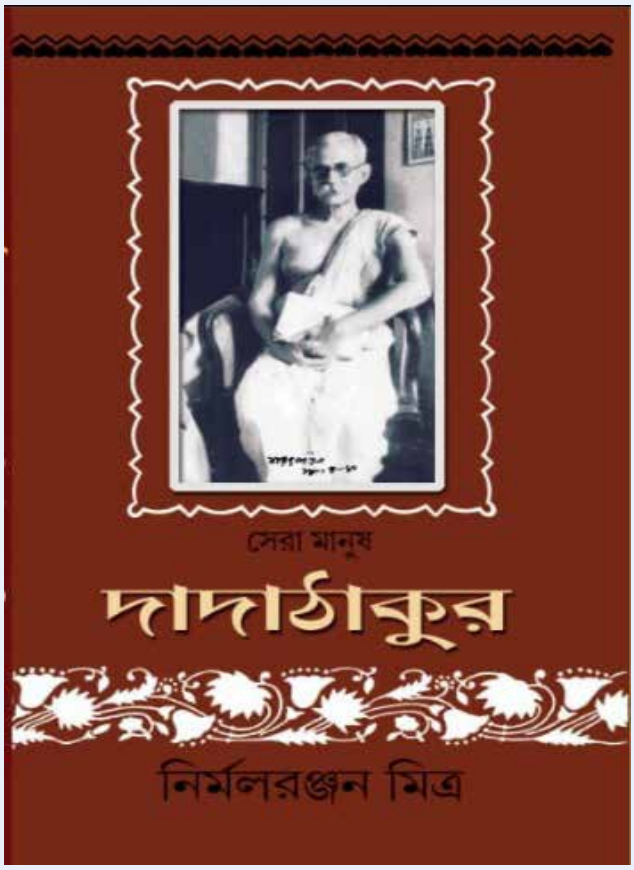

নেইনি। দেখ ভাই পৃথিবী থেকে যাবার আগে এটুকু অন্তত বলে যেতে পারব আমাকে কেউ জুতোতে পারে নি।'

উপস্থিত বুদ্ধি ছিল তাঁর অতুলনীয়। যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো প্রশ্নের জবাব যেন তাঁর ঠোঁটের আগায় লেগে থাকত।

একবার দাদাঠাকুরের এক ছেলের অসুখ করল। তখন ছিল শরৎকাল। সামনে দুর্গাপূজা। দাদাঠাকুরের স্ত্রী প্রতিমা দর্শন করে এসে দাদাঠাকুরকে বললেন, 'ছেলের অসুখের জন্য মায়ের কাছে মানত করে এলাম। মাকে বলে এলাম–মা আমার ছেলেকে ভালো করে দাও, আসছে বছর তোমার ভোগ দেব।'
দাদাঠাকুর বললেন, 'যিনি নিজের ছেলের শুঁড় ভালো করতে পারেন না, তিনি তোমার ছেলের ভালো করবেন কী করে?'

স্বাধীন জীবিকা হিসেবে প্রেস ব্যবসা করতেন দাদাঠাকুর। দফরপুর গ্রামে পণ্ডিত প্রেস স্থাপন করেন। মুদ্রণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু শিখে ফেললেন অল্পক'দিনেই। প্রিন্টার্স গাইড বুক দেখে ছাপাখানার কাজ শিখে ফেললেন। তিনি নিজেই ছিলেন ছাপাখানার মালিক, কম্পোজিটার, প্রুফ রিডার এবং ইঙ্কম্যান। তিনি 'বোতল পুরাণ', 'জঙ্গীপুর সংবাদ' ও 'বিদুষক' নামে পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। তিনি ছিলেন পত্রিকাগুলোর সম্পাদক, মালিক থেকে শুরু করে বিক্রেতা পর্যন্ত। কলকাতার রাস্তায় তিনি ফেরি করে পত্রিকাও বিক্রি করতেন।

তাঁর জীবন ছিল বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। তৎকালীন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতির প্রায় সকল নক্ষত্রের সাথে ছিল তাঁর পরিচয়। কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া। দাদাঠাকুর বলতেন, 'রবিঠাকুরের সাথে দেখা হলে বলবেন আপনি যেমন ঠাকুর আমি তেমনি পণ্ডিত।'

তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়সহ অনেক গুণীজনের সমাবেশ হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে দাদাঠাকুরের লেখা 'কলকাতার ভুল' গানটি গেয়েছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। গান গাওয়া শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গায়ককে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দাদাঠাকুর সম্পর্কে বলেছেন–'শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ও সাক্ষাৎকার বহুবার ঘটিয়াছিল, এবং অন্য সকলের মত এই সমস্ত মিলকে এক অপূর্ব সৌভাগ্যের ফল, আনন্দময় ব্যাপার বলিয়া মনে করি।

ডেকে জানতে চাইলেন, 'গানটি কার লেখা হে?'

'শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের রচনা।'

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর।'

এরপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্বভাষায় মজার এই গানের তুমুল সুখ্যাতি করেছিলেন।

মানুষকে কাঁদানো সোজা। কিন্তু হাসানো? খুবই কঠিন। মানুষ হাসানোর কাজটিকেই কী সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতেন দাদাঠাকুর। কেবল নির্মল রস নয়, ওই হাস্যরসে অর্থও থাকত। এই মানুষ হাসানোর জন্য অর্থাৎ রস পরিবেশনের জন্য সরকারি কিংবা বেসরকারি অনুষ্ঠানে দাদাঠাকুরের ডাক পড়ত প্রায়ই।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দাদাঠাকুর সম্পর্কে বলেছেন–'শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ও সাক্ষাৎকার বহুবার ঘটিয়াছিল, এবং অন্য সকলের মত এই সমস্ত মিলকে এক অপূর্ব সৌভাগ্যের ফল, আনন্দময় ব্যাপার বলিয়া মনে করি। তিনি আমা অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন, অগ্রজ-কল্প, তাঁহার জীবনের নানা কথা, দুঃখ-হর্ষের নানা উপাখ্যান, নানা রসিকতা, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার পরিবারে তাঁহার অবস্থান,– এত খুঁটিনাটির সঙ্গে তিনি আমাকে শুনাইয়াছিলেন– শুনিয়া তৃপ্তি হইত না, এবং এই সব কথার অন্তর্নিহিত মানবিকতা আমাকে আকুল করিত।'

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন–

'আমার এক অতি দুঃখের দিনেও হাসি ছাওয়া ওই মুখখানা হঠাৎ চোখের সামনে দেখেছিলাম।... সতের বছর বয়সে একমাত্র ছেলে আমাদের ছেড়ে চলেই গেল। তারপর শোকের পাথর-চাপা দিন এক-একটা। একদিন মন স্থির করে বসলাম, যা-হোক কিছু লিখব। আর তক্ষুণি এক শোক-প্রহসন যেন সদ্য সদ্য দেখলাম। ...দেখলাম, দাদাঠাকুরের সামনে তাঁর ছেলের চিতা জ্বলছে। উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে নির্মম অথচ এক অন্তরঙ্গ রসিকজন তাঁকে চ্যালেঞ্জ করলেন, এখন এখানে বসে ছড়া বানাতে পারেন?

দাদাঠাকুর পেরেছিলেন। কিন্তু আমার এক বর্ণও লেখা হয়নি। খেদও ছিল না। দাদাঠাকুর আর ক'জন হয়?'

'বিদূষক' পত্রিকার কারণে কলকাতা শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা তো ছিলই, বাংলাদেশের রাজা-মহারাজা জমিদাররাও ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী। নির্মলচন্দ্রের দিল্লির বাসভবনে মোতিলাল নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপত রায়, মুহম্মদ আলী জিন্নাহসহ আরো অনেক মনীষী দাদাঠাকুরের উচ্চাঙ্গের রসিকতা উপভোগ করতেন। পরিহাসপ্রিয় দাদাঠাকুরের রস তাঁদের কাছে ভালো লাগত।

দিল্লিতে বসে একবার দাদাঠাকুর তাঁর ছেলের কাছে চিঠি লিখছিলেন। মোতিলাল নেহরু তা দেখে জানতে চাইলেন, Panditji, are you writing to your wife at home?

দাদাঠাকুর বললেন, No Sir, She is my guaranteed wife.

নেহরু বললেন, How so?

দাদাঠাকুর এবার বুঝিয়ে বললেন, Guaranteed against writing or receiving a letter. That is our family custom, Sir, The husband can not write a letter to his wife, and the wife cannot write a letter to the husband.

দাদাঠাকুরের এমন কথা শুনে মোতিলাল নেহরু খানিকটা বিভ্রান্ত হলেন। এত হাস্যরসিক মানুষটি এত উদার, অথচ কি নিষ্ঠুর নিয়ম।

কথাটা মুহম্মদ আলী জিন্নাহর কানে যেতেই তিনিও চমকে ওঠে বললেন, This is indeed cruel. I should say more cruel than your siittee.

মানে সতীপ্রথার চেয়েও নিষ্ঠুর এই নিয়ম। স্বামী স্ত্রী'র কাছে চিঠি লিখতে পারবে না, এরচেয়ে নির্মমতা আর কী হতে পারে?

নির্মলচন্দ্র এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন। আসলে তো তিনি সব বুঝতে পেরেছেন। দাদাঠাকুর সবাইকে বোকা বানাতে চেয়েছেন। স্ত্রীর কাছে চিঠি লেখা যাবে না, সে নিয়ম তো আছেই, তারচেয়েও বড়কথা হলো দাদাঠাকুরের স্ত্রী নিরক্ষর। বললেনও সে কথা, Panditji has a fooled you all. His wife is illiteret.

দাদাঠাকুরের কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে ঘোর আপত্তি। তিনি বললেন, উঁহু। তা হবে কেন? আমার ব্রাহ্মণী মুড়ি ভাজায় এম-এ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন চরিত্রহীন উপন্যাস লিখে বিখ্যাত। একবার সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দাদাঠাকুরের দেখা। দাদাঠাকুরকে দেখে শরৎচন্দ্র বললেন, 'এই যে বিদুষক শরৎচন্দ্র!' তৎক্ষণাৎ দাদাঠাকুর বললেন, 'চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র যে!'

বঙ্কিমযুগের প্রবীণ সাহিত্যিক ও বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে দাদাঠাকুরের ছিল বেশ হৃদ্যতা। বয়সে বড় হেমেন্দ্রকে দাদাঠাকুর 'দাদা' বলে ডাকতেন। একদিন হেমেন্দ্রপ্রসাদের গোয়াবাগানের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন দাদাঠাকুর। খালি গা, খালি পা, বগলে গামছায় বাঁধা পুটুলি। দাদাঠাকুরের বেশভুষা দেখে হেমেন্দ্রপ্রসাদের বাড়ির কুকুরের পছন্দ হলো না। ছুটে এসে দাদাঠাকুরের পায়ে দিল কামড়। রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটে গেল। হেমেন্দ্রকুমার নিজে টিংচার আইডিন, তুলো বের করে ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। দাদাঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, 'কুকুরে কামড়াবে বলে কি আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকো?'

লজ্জিত হেমেন্দ্রকুমার বললেন, 'আরো তো লোকজন আসে। কই এঁদের কাউকে তো কামড়ায়নি। তোমাকে কামড়ালো কেন?'

দাদাঠাকুর বললেন, 'কায়েতের কুকুর বামুনের পায়ের লোভ সামলাতে পারেনি।'

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন কায়স্থ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে খুব স্নেহ করতেন দাদাঠাকুর। একদিন সুভাষচন্দ্রের সাথে দেখা হতেই দাদাঠাকুর বললেন, 'দ্যাখো সুভাষ, আমার মনে হয় তুমিই বিদেশীদের তাড়াবে।'

সুভাষচন্দ্র মুখে বললেন, 'কি করে বুঝলেন? দেশে তো অন্য নেতারাও আছেন।'

দাদাঠাকুর বললেন, 'তা অবশ্য আছেন। তবে তোমার জুতোর ঠোক্কর হজম করা বিদেশীদের পক্ষে কঠিনই হবে সুভাষ। তোমার জুতোর ঠোক্করে ওরা একেবারেই কাবু হয়ে যাবে। আর কাবু হয়ে এ দেশটাও ছেড়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।'

সুভাষ বললেন, 'কারণ?'

দাদাঠাকুর বললেন, 'কারণ তোমার নামের গোড়াতেও 'সু'। শেষেও 'সু'। তোমার জুতোর ঠোক্কর হজম করা সহজ হবে ওদের? তুমিই বলো।'

দাদাঠাকুরের নিজস্ব একটা খেলা ছিল। সেটা হচ্ছে প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর। এরকম কিছু নমুনা–

প্রশ্ন : এটা কি গ্রাম?

উত্তর : এ টাকি গ্রাম।

প্রশ্ন : রাম-রাবনের যুদ্ধের কারণ জান কী?

উত্তর : রাম-রাবনের যুদ্ধের কারণ জানকি।

প্রশ্ন : কে সব দেবতার মধ্যে পালনকর্তা?

উত্তর : কেসব দেবতার মধ্যে পালনকর্তা।

প্রশ্ন : এ ক'জনের খোরাক?

উত্তর : এক জনের খোরাক।

প্রশ্ন : সংসারটা কার বশ?

উত্তর : সংসার টাকার বশ।
প্রশ্ন : এ কি মা?
উত্তর : এ কিমা।
প্রশ্ন : মাসী কি দিয়েছে?
উত্তর : মা সিকি দিয়েছে।
প্রশ্ন : এ শিল্প কর্ম কার কৃত?
উত্তর : এ শিল্প কর্মকার কৃত।
প্রশ্ন : অরুচি হলে নিম কি রুচিকর?
উত্তর : অরুচি হলে নিমকি রুচিকর।
প্রশ্ন : হাবিলদার মহম্মদ খাঁ কি রঙের পোশাক পরেন?
উত্তর : হাবিলদার মহম্মদ খাঁকি রঙের পোশাক পরেন।
প্রশ্ন : মহেন্দ্রপাল কি চড়ে বিয়ে করতে গিয়েছিল?
উত্তর : মহেন্দ্র পালকি চড়ে বিয়ে করতে গিয়েছিল।
প্রশ্ন : সে অন্ধ কার বাড়িতে থাকে?
উত্তর : সে অন্ধকার বাড়িতে থাকে।
প্রশ্ন : নারায়ণকে গর্ভে ধারণ করে কষ্ট পেয়েছেন এর দৃষ্টান্ত দেব কি?
উত্তর : নারায়ণকে গর্ভে ধারণ করে কষ্ট পেয়েছেন এর দৃষ্টান্ত দেবকি।
প্রশ্ন : সে নাকি সুরে কথা কয়?
উত্তর : সে নাকি সুরে কথা কয়।
প্রশ্ন : বড়দিনে ভেট কি দিলে?
উত্তর : বড়দিনে ভেটকি দিলে।

প্যালিনড্রোম মজার একটা জিনিস। বামদিক থেকে ডানদিক অথবা ডানদিক থেকে বামদিক, যেদিক থেকেই পড়া হোক না কেন, যে বাক্য বা শব্দ একই থাকে, সেটাকেই ইংরেজিতে প্যালিনড্রোম বলে। বাংলা প্যালিনড্রোমের ভাণ্ডারও অপূর্ণ রাখেননি দাদাঠাকুর।

একটি চিঠিতে দাদাঠাকুর লিখেছেন, "...ইংরাজী EYE উল্টে না, বাংলা নয়ন উল্টে না। 'নয়ন' ইংরাজীতে লিখলেও উল্টে না 'NAYAN'। আমার ইংরাজী জন্ম খৃষ্টাব্দ ১৮৮১, তা-ও উল্টায় না।..."

দাদাঠাকুরের তৈরি কিছু প্যালিনড্রোম–
ক. থাক রবি কবির কথা।
খ. কীর্তন মঞ্চ পরে পঞ্চম নর্তকী।
গ. বেনে তেল সলতে নেবে।
ঘ. রমা তো মামা তোমার।
ঙ. Rise to vote sir.
চ. নিমাই খসে সেখ ইমানি।
ছ. চার সের চা।
জ. বিরহে রাধা নয়ন ধারা হেরবি।
ঝ. ক্ষীর সর রস রক্ষী।
ঞ. সব বেপারী পাবে বস।

শব্দের সরস উৎপত্তি উদ্ভাবনে দাদাঠাকুরের জুড়ি মেলা ভার। যেমন ইংরেজি RICH শব্দটি। এটা নিয়ে নির্মম সত্য অথচ সরস একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। দাদাঠাকুর বলতেন, ইংরেজরা ধনী হবার মন্ত্র জানতেন। আর ওই মন্ত্রের জোরেই ইংরেজ কর্মচারীরা ভারতবর্ষে এসে ধনবান হয়ে স্বদেশে ফিরতেন। মন্ত্রটা কী?

মন্ত্রটি হচ্ছে– Rob India Come Home সংক্ষেপে RICH.

অর্থাৎ ভারতে এসে লুট করো আর ধনী হয়ে দেশে ফেরো।

রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমারের সাথে দেখা করতে প্রায়ই রাজভবনে যেতেন দাদাঠাকুর। দুজন মিলতও দারুণ। রাজ্যপালের নির্দেশ ছিল, দাদাঠাকুর দেখা করতে এলে যেন তার পথরোধ করা না হয়।

একবার দেখা করতে এলেন দাদাঠাকুর। হরেন্দ্রকুমার দাদাঠাকুরকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, পণ্ডিত মশায়, এখানে আসতে কোনো অসুবিধা হয় নি তো?

দাদাঠাকুর বললেন, কিছুমাত্র না। একজন নরকের সাথি আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেছে।

নরকের সাথি! হরেন্দ্রকুমার অপার কৌতূহল আর বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে জানতে চাইলেন, নরকের সাথি? তার মানে?

দাদাঠাকুর স্বভাবসুলভ হাসি দিয়ে বললেন, ওই যে, যাদের মাথায় হেলমেট (helmet) থাকে, তাদেরই তো নরকের সাথি বলে। হেল মানে নরক আর মেট মানে সাথি।

ওই সময়কার বিখ্যাত এক অভিনেতা ছিলেন শিশির ভাদুড়ি। মঞ্চকাঁপানো পারফর্ম দেখাতেন। দাদাঠাকুরের সাথে তার সম্পর্কটাও ছিল বেশ গভীর। তবে তার একটা বদঅভ্যাস ছিল, যেটা দাদাঠাকুর একেবারেই সইতে পারতেন না। মদ্যপান। আজীবন মদ্যপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া মানুষ দাদাঠাকুর তবু শিশির ভাদুড়ির সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছিলেন অভিনয় দক্ষতার জন্য। কিন্তু একদিন নির্দিষ্ট ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে উঠেও অভিনয় করতে পারছিলেন না শিশির ভাদুড়ি। সবাই তো অবাক! হল কি শিশিরের? তবে কি অভিনয় ভুলে গেলেন? খবর নিয়ে জানা গেল সেদিন অভিনয় শুরুর আগেই প্রচুর মদ্যপান করেছিলেন। দাদাঠাকুরের কানেও গেল খবরটা। আর খবরটা শুনে দাদাঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন, পারবে কোত্থেকে? ও তো সেদিন শিশির ভাদুড়ি ছিল না, সেদিন ও ছিল বোতলের ভাদুড়ি।

১৯৫৮ সাল। কলকাতার যুগান্তর সাময়িক বিভাগে তখন দাদাঠাকুরের জীবনের কাহিনি 'দাদাঠাকুর' নামে প্রকাশিত হচ্ছে। তখন দুজন মানুষ দেখতে একই রকম ছিলেন। দুজনেরই খালি পা, গায়ে চাদর। কাপড় হাঁটু অবধি। পাকা গোঁফ। পাকা চুল।

এঁদেরই একজন চলেছেন। বড়ই চেনাচেনা চেহারাটি। এক পুলিসের নজরে পড়লেন তিনি। আর নজরে পড়তেই তার গতি রোধ করে সামরিক কায়দায় লম্বা একটা সেলাম ঠুকল সে। বুড়ো মানুষটি ঘাবড়ে গেলেন। লাঠিকেও তার ভয়, পুলিসকেও ভয়। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, পুলিসের এই আকস্মিক বিনয়ের কারণ কী। পুলিসের সৌজন্য সপ্তাহ চলছে বলেও মনে করতে পারলেন না। দুপুরে শেয়ালদা স্টেশনের পাঁচ নম্বর গেটে তিনি দাঁড়ালেন। আর তার সাথি গেছেন টিকিট কিনতে। টিকিট-কালেক্টর আর চেকাররা তাঁকে ঘিরে জটলা তৈরি করেছে। সবার মধ্যেই চাপা উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা; কোথায় বসানো যায় এঁকে। কি ভাবে সম্মান দেখানো যায়?

তিনি বুঝতে পারলেন না, হঠাৎ সবাই তাঁকে এত সম্মান দেখাচ্ছে কেন? এবার তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটল। তিনি বুঝতে পারলেন। আর বুঝতে পেরেই জোরে চেঁচিয়ে ওঠলেন, ভুল, ভুল। তোরা সবাই ভুল করছিস। আমি রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রাক্তন মন্ত্রী অথবা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা নই।

তারপর আস্তে করে বললেন, আমি শরৎচন্দ্র পণ্ডিত।

ঘোর ভাঙল উপস্থিত সবার। ও আপনিই আমাদের দা-ঠাকুর' যুগান্তর পত্রিকার পরিচিত দাদাঠাকুর,– বর্ধমানের শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা নন?

দাদাঠাকুর আর যাদবেন্দ্র– দু'জন দেখতে ছিলেন একই রকম। যেন জমজ। যুগান্তর পত্রিকার ১৯৫৮ সালের ১১ ডিসেম্বর সংখ্যায় লেখা হয়েছিল– ভ্রান্তিবিলাস এড়াবার জন্য এঁদের কেউ গোঁফ জোড়াটা কামাবেন? দা-ঠাকুর নাকি তাই ভাবছেন।

দাদাঠাকুর সেদিনই পরিমল গোস্বামীকে বলেছিলেন, কি ফ্যাসাদে পড়লাম বল দেখি! যাদবেন্দ্রবাবুর সুযোগসন্ধানী কোন শত্রু (যদি থেকে থাকে) যাদবেন্দ্র-ভ্রমে আমার উপর চড়াও হতে পারে।

পরিমল গোস্বামী বললেন, সে-আশঙ্কা তো যাদবেন্দ্রবাবুও করতে পারেন।

দাদাঠাকুর এবার সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেলেন। চিন্তিত স্বরে বললেন, যা বলেছিস। তবে কি গোঁফ কামাব?

একবার দাদাঠাকুরের কাছে একজন জানতে চেয়েছিল, আপনার জন্মদিন হয় না?

নির্মম রসিক দাদাঠাকুর জানিয়ে দিলেন, আমি এক জন্মদীন তার আবার জন্মদিন কিরে?

আর্থিকভাবে হয়তো তিনি ছিলেন জন্মদীন। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের মতে তিনি তো ছিলেন হাসির অবতার। ৮৭ বছর বয়সে–১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল ইহজগৎ থেকে চিরবিদায় নেন তিনি। কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর অসংখ্য হাসির কবিতা, গান এবং গল্প। দুর্দশাময় এক জীবনের অসংখ্য সরস গল্প।

আহমেদ রিয়াজ ॥ শিশুসাহিত্যিক

শেষ পাতা

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী পুরুষ

উল্লাসকর দত্ত

হিমাদ্রিশেখর সরকার

উল্লাসকর দত্তের জন্ম ১৬ এপ্রিল ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মেছিলেন তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার (বর্তমানে জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ) কালীকচ্ছ গ্রামের বিখ্যাত দত্তরায় বংশের এক ব্রাহ্ম পরিবারে। বাবা স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ দ্বিজদাস দত্ত (১৮৫৪-১৯৩৫)। মা মুক্তকেশী। ঠাকুরদা মুন্সী রামদুলাল নন্দী (১৭৮৫-১৮৫২)। উল্লাসকর ছিলেন মা-বাবার দ্বিতীয় সন্তান। পিতা দ্বিজদাস দত্ত ছিলেন একাধারে বৈদিক সাহিত্যের পণ্ডিত, দার্শনিক, লেখক ও শিক্ষাবিদ। তিনি ১৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সরকারি বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা পড়তে ইংল্যান্ড গেছেন। ফিরে এসে কলকাতার বেথুন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন। একসময় চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ হন। পরে হাওড়ার শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষিবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন। এখানে কার্যরত অবস্থায় পুত্র উল্লাসকরের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য সরকার তাকে অবসর নিতে বাধ্য করে। শেষজীবনে ঢাকার 'মণিপুরী ফার্ম'-এ (বর্তমানে খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা) কৃষিবিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেন। প্রথ মজীবনে 'ব্রাহ্মসমাজ'-এ যোগ দেয়ার অপরাধে পিতা গঙ্গাদাস দত্তরায় দ্বিজদাসকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। ছোঁবেলায় উল্লাসকরের ডাকনাম ছিল 'পালু'। কেউ কেউ তার ছদ্মনাম 'অভিরাম' বলে ধারণা করেন।

উল্লাসকর এন্ট্রান্স পাশ করেন কলকাতা থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে। এরপর বিজ্ঞানবিষয় নিয়ে কলকাতার বিখ্যাত 'প্রেসিডেন্সি কলেজ'-এ ভর্তি হন। পিতা দ্বিজদাস দত্তও একই কলেজের কৃতীছাত্র ছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ এমএ পাশ করেন। কিন্তু পুত্রের নেশা ছিল রসায়নশাস্ত্রে। যা পরবর্তীকালে বোমা তৈরিতে তার কৃতিত্ব বয়ে আনে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র থাকাকালীন উল্লাসকর স্বদেশি আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। কলকাতার বিভিন্ন হলে বিশিষ্ট বাগ্মী ও স্বদেশী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা শোনেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানে তার মূল প্রেরণা শ্বশুর বিপিনচন্দ্র পাল।

সফল বোমা পরীক্ষার প্রায় তিন মাস পর কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য বিহারের মজঃফরপুরে পাঠানো হয় ক্ষুদিরাম বসু আর প্রফুল্ল চাকীকে। তারা উল্লাসকর দত্তের তৈরি করা বোমা সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বোমা কিংসফোর্ডের গাড়ির বদলে অন্য ইংরেজের গাড়িতে পড়ে। পরের দিন ধরা পড়েন ক্ষুদিরাম। প্রফুল্ল ধরা পড়ার আগে নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। ফাঁসি হয়ে যায় ক্ষুদিরামের (১১ আগস্ট ১৯০৮)। ১২ বছর কারাগারে কাটানোর পর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি মেলে উল্লাসকরের।

ফিরে আসেন কলকাতায়। জীবিকার তাগিদে হ্যারিসন রোডে ঘিয়ের দোকান খোলেন। লোকসান দিয়ে কিছুদিন পর চলে এলেন জন্মগ্রাম কালীকচ্ছে। এখানে তাকে প্রতি সপ্তাহে একদিন সরাইল থানায় হাজিরা দিতে হয়। যে কারণে কলকাতা বা দূরে কোথাও যেতে পারেন না। বাড়িতেই থাকেন। নিজের তৈরি নৌকোতে ভেসে বেড়ান তিতাস নদীতে। জন্মশিল্পী উল্লাসকর বাঁশি আর দোতারা বাজান। লোকে তন্ময় হয়ে শুনে। গ্রামের ছেলেরা ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসেন তার কারাজীবনের কাহিনি শুনতে। অনুরোধ আসে কারাজীবনের ঘটনা নিয়ে বই লেখার। লিখে ফেলেন 'আমার কারাজীবনী'। পরবর্তীকালে তিনিই যার ইংরেজি অনুবাদ করেন Twelve years of prison life .(প্রকাশকাল ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ)। কুমিল্লার ঐতিহাসিক 'সিংহপ্রেস' থেকে এটি শ্রীললিতচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 'আমার কারা-জীবনী'-এর ২য় সংস্করণ 'কারা-জীবনী' নামে প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৩০ বঙ্গাব্দে, মোতাবেক নভেম্বর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশক কলকাতার বিখ্যাত 'আর্য্য পাব্লিশিং হাউজ'।

কালীকচ্ছের বাড়িতে নিঃসঙ্গ পালু। বাবা-মা কুমিল্লায়। দাদা মোহিনীমোহন কলকাতায়। ছোট ভাই সুখসাগর লন্ডনে। উল্লাসের সঙ্গী তখন দোতারা, বাঁশি আর 'ভিড়মি খাওয়া' (যে রোগে প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়)। ১৭ মে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ৮০ বছর বয়সে ইতিহাসের এই ট্র্যাজিক মহানায়কের জীবনাবসান হয়।

হিমাদ্রিশেখর সরকার ॥ প্রাবন্ধিক

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

লেখা পাঠানোর নির্দেশনাবলি

ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা অবশ্যই এমএস ওয়ার্ড (SutonnyMJ)-তে কম্পোজ করে দিতে হবে। সঙ্গে চেকবইয়ের ভেতরের পাতার ছবি তুলে বা স্ক্যান করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তথ্যসমূহ ইংরেজিতে পূরণ করে ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠান। অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। – সম্পাদক

ভারতীয় হাই কমিশন প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: inf2.dhaka@mea.gov.in

Name :..... Pen Name :.....

Address :..... Bank Account Name :.....

..... Account No :.....

..... Bank Name :.....

Phone/Mobile :..... Branch Name :.....

e-mail :..... Routing No :.....

হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ১৬ এপ্রিল ২০২৩-এ কুষ্টিয়ায় একটি নতুন ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র (আইভ্যাক) উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ।

ভারতীয় হাই কমিশন ঢাকা ১১ এপ্রিল ২০২৩-এ ঢাকায় একটি ইফতার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ও বাংলাদেশের মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পিসহ সরকার, আইনসভা, রাজনৈতিক দল, সশস্ত্র বাহিনী, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ীমহল, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিকমহলসহ বাংলাদেশের সর্বস্তরের বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্যে হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের চেতনা বৃদ্ধিতে ইফতারের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

ভারতীয় হাই কমিশন ঢাকা ০৬ এপ্রিল, ২০২৩-এ আয়োজিত একটি স্মারক অনুষ্ঠানে সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ মাসিক 'ভারত বিচিত্রা'র একটি বিশেষ সংস্করণের মোড়ক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটির সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছে। মাননীয় ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মাসহ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, April, 2023

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি
হাউজ নং : ২৪, রোড নং : ০২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
টেলিফোন : +৮৮০২৯৬১২৩২২, ইমেইল : lib.dhaka@mea.gov.in

লাইব্রেরি সময় : রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার ॥ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিট

লাইব্রেরি মেম্বারশিপ ফরম : www.hcidhaka.gov.in/pdf/membershipapplicationform-292018.pdf

ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভারতীয় হাই কমিশন ও ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো এজেন্টের সম্পর্ক নেই।
ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো ভিসা ফি নেয় না।
ভিসা আবেদন কেন্দ্র ভিসা প্রসেসিং ফি হিসেবে মাত্র ৮০০ টাকা নিয়ে থাকে।

আবেদন করার আগে দয়া করে এই তথ্যগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন।